সেকুলারিজম

অধ্যাপক ফজলুর রহমান

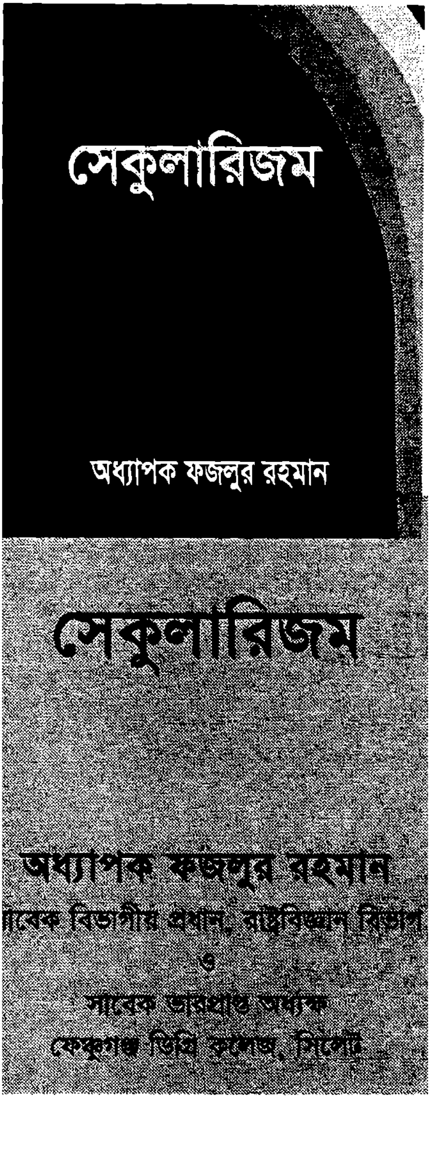

সৃজনশীল বই প্রকাশক ও বিক্রেতা

প্রত্যয় প্রকাশনী

www.nagorikpathagar.org

সেকুলারিজম
অধ্যাপক ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মু. আতাউর রহমান সরকার
প্রত্যয় প্রকাশনী

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১০
দ্বিতীয় সংস্করণ : মে ২০১০
তৃতীয় সংস্করণ : ২০১৫

কম্পিউটার কম্পোজ
আসমা এন্ড কাইফ কম্পিউটার
মগবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ : সাঈদ

মুদ্রণ
আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা মাত্র

Secularism, by Professor Fazlur Rahman
Publiched by : Prottoy Prakashony, 491/D/2 Elephant Road
Wireless Railgate, Boro Moghbazar, Dhaka-1217 Bangladesh
Mobile : 01684511668, 01966051854
E-mail : prottoyprakashony@gmail.com
3rd Edition : June 2015
Price : Taka 60 only

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	:	সেকুলারিজমের সংজ্ঞা	৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	হযরত ঈসা (আ.) এর আগমন	১১
তৃতীয় অধ্যায়	:	খ্রিস্টপূর্ব ইউরোপে ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থা	১৭
চতুর্থ অধ্যায়	:	ইউরোপে খ্রিস্টধর্ম	২০
পঞ্চম অধ্যায়	:	খ্রিস্টধর্ম ও রাজশক্তি	২৬
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	রাজশক্তির ছত্রছায়ায় যাজক শ্রেণীর কার্যকলাপ	৩০
সপ্তম অধ্যায়	:	সংস্কার ও প্রতিসংস্কার আন্দোলন	৪০
অষ্টম অধ্যায়	:	খ্রিস্টধর্ম পরিণতিতে মানব রচিত মতবাদ খ্রিস্টবাদ	৪৩
নবম অধ্যায়	:	সেকুলারিজমের উদ্ভব, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ	৫০
দশম অধ্যায়	:	সেকুলার বাগানের কয়েকটি চারা	৫৮
একাদশ অধ্যায়	:	বিপর্যস্ত মানবতা	৬৯
দ্বাদশ অধ্যায়	:	মুসলিম বিশ্বে সেকুলারিজম	৮১
ত্রয়োদশ অধ্যায়	:	বাংলাদেশে মাত্র একজন শতভাগ খাঁটি সেকুলার	৮৬
চতুর্দশ অধ্যায়	:	ইসলাম	১০৯
পরিশিষ্ট	:		১২৭

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যে ১ম সংস্করণের বইগুলো শেষ হয়ে যায়। গ্রন্থটির পাঠকপ্রিয়তা উপলব্ধি করে আল্লাহতায়ালার শুকরিয়া প্রকাশ করছি। আর এ জন্যেই দ্বিতীয় সংস্করণের উদ্যোগ। পাঠকসমাজের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বেশ কয়েকজন পাঠক আমাকে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে উৎসাহিত করেছেন। সর্বপ্রথম যিনি আমাকে উৎসাহিত করেন, তিনি আমার প্রতিবেশী শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও সুলেখক জনাব মুহিবুর রহমান। আরো একজন উৎসাহী পাঠক যার নাম উল্লেখ না করলে কৃতঘ্ন হয়ে যাব, যিনি অসুস্থ, প্রায় শয্যাশায়ী, প্যারালাইসিসসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছেন- অথচ ঘন ঘন টেলিফোন করে আমাকে পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করেছেন, তিনি হলেন সুসাহিত্যিক, গবেষক, রাগীব রাবেয়া সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত, শ্রদ্ধেয় রম্য লেখক জনাব আব্দুল হাকিম তাপাদার। এছাড়া শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকসহ অনেক বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজন আমাকে পরামর্শ প্রদান করেছেন। বইটি প্রকাশের পর ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের উপর দু'টি প্রবন্ধ আমার নজরে এসেছে। একটির লেখক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ। অন্যটির লেখক ব্যাংকার ও গবেষক জনাব নূরুল ইসলাম। প্রবন্ধ দুটো থেকে আমি কিছু তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

দ্বিতীয় সংস্করণে বইটির নাম সংক্ষিপ্ত করে শুধু 'সেকুলারিজম' রাখা হল। প্রথম প্রকাশের সময় বইটির নাম ছিল 'সেকুলারিজম, ধর্ম নিরপেক্ষমতবাদ, ইহজাগতিকতাবাদ, ধর্মহীনমতবাদ।'

বইয়ের তথ্য উপাত্ত সে সকল রেফারেন্স বুক থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, প্রায় সব কয়টি রেফারেন্স বইয়ের লেখক ও প্রকাশকের তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

বইটিতে 'মুসলিম বিশ্বে সেকুলারিজম' এ শিরোনামে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য অধ্যায়ে কিছু তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। বিশেষ করে শেষ দুই অধ্যায় সমৃদ্ধ করা হয়েছে। পরিশিষ্ট সংযোজন করে আরো কিছু তথ্য প্রদান করা হয়েছে। বইটির জনপ্রিয়তা অনুভব করে পাঠক সমাজের কথা বিবেচনায় এনে বইয়ের মূল্য আগের তুলনায় কম রাখা হয়েছে। আশা করি পাঠকসমাজ থেকে আগের চেয়ে আরো বেশি সড়া পাব এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে পরবর্তী সংস্করণে পুস্তকটি আরো সমৃদ্ধ করার প্রয়াস পাব।

মো. ফজলুর রহমান
১ মে-২০১০ (শ্রমিক দিবস)

www.nagorikpathagar.org

সেকুলারিজম নিয়ে ইদানীং আমাদের দেশে বেশ চর্চা হচ্ছে। এ মতবাদের পক্ষে বিপক্ষে বহুলোকের অবস্থান। এ মতবাদ সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হবার জন্যে পক্ষে বিপক্ষের কয়েকজনের সাথে আলাপ করে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি।

অতঃপর এ সংক্রান্ত বই-পুস্তক পাঠের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আমার দুর্ভাগ্য আমি বাংলায় কয়েকটি পুস্তিকা এবং কোনো কোনো প্রবন্ধ-সঙ্কলনের মধ্যে মাত্র একটি প্রবন্ধ ব্যতীত এ মতবাদের উপর পূর্ণাঙ্গ কোনো বই সংগ্রহ করতে সক্ষম হইনি।

তাই সেকুলারিজমের উপর একটি বই লেখার আমার প্রবল আগ্রহ জন্মালো। লেখার কাজে হাত দেবার পর আমার মনে প্রশ্ন সৃষ্টি হলো– সেকুলারিজমের সঠিক সংজ্ঞা কী? কোন যুগে এ মতবাদের উদ্ভব হয়? পৃথিবীর কোন অংশ এ মতবাদের উৎপত্তিস্থল? কোন ঐতিহাসিক প্রেক্ষপটে এ মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে? সেকুলার চিন্তাধারা একক না এর শাখা-প্রশাখা আছে? মানবসমাজে এ মতবাদ কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে? সমাজ এ থেকে কী ফল লাভ করল? এর পরিণতি কী? এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে দেশি-বিদেশি বহু বই-পুস্তক আমাকে অধ্যয়ন করতে হয়েছে। এ অধ্যয়নের ফলে আমার যে ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, তা সাজিয়ে-গুছিয়ে লেখার চেষ্টা করেছি। আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেই এ পুস্তক রচনার প্রয়াস পেয়েছি। পুস্তক রচনায় কতটুকু সফল হয়েছি তা পাঠকসমাজের বিবেচ্য।

আমার জীবনসঙ্গিনী সিলেট গভ. গার্লস হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র শিক্ষিকা খায়রুন নেছা খাতুন আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে এবং পুস্তকটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করেছেন। আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। পাঠকসমাজ থেকে সাড়া পেলে ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে পরবর্তী সংস্করণে পুস্তকটি আরো সমৃদ্ধ করার আশা পোষণ করছি।

মো. ফজলুর রহমান
বিজয় দিবস, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৯ খ্রি.
দার আল-খায়ের
মানিকপীর রোড, সিলেট।
টেলিফোন : ০৮২১-৭১৫৬৫৩

www.nagorikpathagar.org

ফেঞ্চুগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক ফজলুর রহমানের সুলিখিত সেকুলারিজম বইটি প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ে সমসাময়িক বিষয়ে জ্ঞানার্জন জরুরি। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নিয়ে মানবসমাজে নানামুখী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস লেখকের এই লেখা ধর্ম বিশ্বাসকে নাকচ করে দেয়া 'সেকুলারিজম' সম্পর্কে সত্য সন্ধানী মানুষের চোখ খুলে দেবে।

এই বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় সাবেক ছাত্রনেতা মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন ভাইয়ের উৎসাহ, সহযোগিতা কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করছি। এরপর লেখকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য মহান আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

মু. আতাউর রহমান সরকার
sarkerrahman32@gmail.com

www.nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়

সেকুলারিজমের সংজ্ঞা

১. Encyclopedia Americana এর ২৪ নং Volume এ সেকুলারিজমের সংজ্ঞা নিম্নরূপ প্রদান করা হয়েছে :

Secularism is an ethical system founded on the principles of natural morality and independent of revealed religion or super naturalism.

সেকুলারিজম একটি নৈতিক ব্যবস্থা, যা কেবল প্রাকৃতিক নৈতিকতার মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ঐশী সূত্রে প্রাপ্ত ধর্ম বা রহস্যবাদমুক্ত।

২. Holyoake যিনি সেকুলারিজম নামকরণের প্রথম উদ্যোক্তা এবং যিনি Secular Society গঠন করে এর পক্ষে প্রথম আন্দোলন শুরু করেন, তার লিখিত A Confession of Belief বইতে যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে :

A form of opinion which concerns itself only with the questions, the issues of which can be tested by the experience of this life.

সেকুলারিজম হল এক ধরনের মতামত যা ইহজগতে এই জীবনের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষা সম্ভব বিষয়গুলোকে স্পর্শ করে।

৩. English Secularism *বইয়ের প্রদত্ত সংজ্ঞা : Secularism is a code of duty pertaining to this life, founded on consideration purely human and intended mainly for those who find theology indefinite, inadequate, unreliable or unbelievable.

সেকুলারিজম এমন একটি কর্তব্য পালন পদ্ধতি, যা শুধু ইহজীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট ও কেবলমাত্র মানবীয় বিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের জন্য যারা ধর্মতত্ত্বকে অস্পষ্ট, অপূর্ণ, অনির্ভরযোগ্য এবং অবিশ্বাস্য মনে করে।

৪. Oxfor Dictionary তে Secularism এর সংজ্ঞা : Secularism means the doctrine morality should be based solely on

* ১. Holyoake; English Secularism. A confession of Belief : (Chicago 1896)

www.nagorikpathagar.org

regard to the wellbeing of mankind in the present life, to exclusion of all consideration drawn from belief in God or in future life.

সেকুলারিজম এমন একটি মতবাদ, যে মতবাদে মানবজাতির ইহজগতের কল্যাণ চিন্তার উপর গড়ে উঠবে এমন এক নৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে থাকবে না কোনো ধরনের আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাসভিত্তিক বিবেচনা।

৫. Encyclopedia বা বিশ্বকোষে Secularism এর নিম্নরূপ দুটো সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে :

No-1. Secular spirit or tendency especially a system of political or social philosophy that reject all from of religious faith.

সেকুলারিজম এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে সাধারণ শিক্ষা ও সামাজিক সংস্থা পরিচালনায় কোনো ধরনের ধর্মীয় উপাদান অন্তর্ভুক্ত হবে না। এখানে যে অনুবাদ দেওয়া হয়েছে তা মূল বইয়ের ২ নং Defination এর অনুবাদ।

৬. Random House Dictionary of English Language (College Edition, New york-1968) গ্রন্থে Secularism এর তিনটি সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে :

No-1. Not regarded as relgious & spiritually sacred.

সেকুলারিজম এমন একটি মতবাদ যা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র বলে বিবেচিত নয়।

No-2. Not partaining to or connected with any religion.

যা কোনোভাবেই ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয়।

No-3. Not belonging to a religious order.

ধর্মীয় আইন-কানুন বহির্ভূত ব্যবস্থা।

৭. The Advanced Learners' Dictionary of Current Engligh এ সেকুলারিজমের প্রদত্ত সংজ্ঞা :

-Worldly or material, not religious or spiritual.

ইহজাগতিক অথবা পার্থিব, ধর্মীয় কিংবা আধ্যাত্মিক নয়।

The view that morality & education should not be based on Religion.

www.nagorikpathagar.org

সেকুলারিজম এমন একটি ব্যবস্থা যার অধীনে নৈতিকতা ও শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মের উপর ভিত্তি করে হবে না।

৮. Oxford Advanced- Learners' Dictionary'র প্রদত্ত সংজ্ঞা :

The belief that religion should not be involved in the organisation of society, education etc.

সমাজ সংগঠন, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে ধর্ম সংশ্লিষ্ট হতে পারবে না এমন বিশ্বাসের নাম হলো সেকুলারিজম।

৯. Wikipaedia তে সেকুলারিজমের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে :

সেকুলারিজম জ্ঞান হলো সেই জ্ঞান, যার ভিত্তি রয়েছে ইহকালে, যা এই জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট, এ জগতের কল্যাণ সাধন করে এবং যা এ জগতের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষা করা সম্ভব।

১০. Encyclopedia of Religion & Ethics এ প্রদত্ত সংজ্ঞা :

মানবকল্যাণ নির্ধারিত হবে যুক্তির মাধ্যমে। ওহি বা ধর্মীয় নির্দেশনার মাধ্যমে নয়। আর যুক্তি পরীক্ষিত হবে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

১১. মুক্তধারা প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ তৃতীয় খণ্ডে- Secularism তথা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে- 'সমাজ ব্যবস্থা এমন নীতির উপর নির্ভর করিবে যাহাতে মানুষের নৈতিক আচরণ ও আচরণ-মান ইহকালীন ব্যাপার ও সামাজিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত ও নির্ধারিত হয় এবং তজ্জন্য ধর্মের অনুশাসনের দিকে নজর দেবার প্রয়োজন নাই।'

১২. বাংলা একাডেমী কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত English-Bengali Dictionary তে- Secular শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে- পার্থিব, ইহজাগতিক, জড়জাগতিক, লোকায়ত। আর Secularism সম্পর্কে বলা হয়েছে-নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয় এই মতবাদ; ইহজাগতিকতা, ইহবাদ।

১৩. A Short History of Secularism (Published in 2008 by I.B. Tauris & Co. Ltd, London) এর লেখক Graeme Smith সেকুলারিজমের ব্যাপারে লেখেন :

The latin term from which the word 'Secular' is derived- 'Saeculum' means generation or age and came to mean that which belongs to this life, to the here and now in this world.

www.nagorikpathagar.org

It is used as a short hand for the ideology which shape contemporary society without reference to divine.

ল্যাটিন শব্দ– 'Saeculum' থেকে Secular শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে। Saeculum এর অর্থ যুগ, জেনারেশন। পরিভাষাগতভাবে এর অর্থ দাঁড়ায়– যা ইহজগৎ, বর্তমান দুনিয়া ও এই জীবন সম্পর্কিত। এটা ব্যবহৃত হয় ঐ আদর্শের শিরোনাম হিসেবে যে আদর্শ স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ (ওহি) বাদ দিয়ে সমসাময়িক সমাজ বিনির্মাণ করেছে।

Graeme Smith আরো বলেন : Secularism was born of cristianity, daringly & originally. It is impossible to understand the idea of Secular without appreciationg that, at root, it is cristian.

এটা নির্ভয়ে বলা যায় যে, মূলত খ্রিস্টবাদ থেকে সেকুলারিজমের জন্ম। এটা না বুঝার কোনো কারণ নেই যে, সেকুলার আইডিয়ার মূল জড় খ্রিস্টবাদের অভ্যন্তরে নিহিত।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর সারসংক্ষেপ :

Secular ইংরেজি ভাষার একটি শব্দ। এ শব্দটি ল্যাটিন ভাষার Saeculum শব্দ থেকে এসেছে। Saeculum শব্দের অর্থ হলো– ইহজগৎ। পরিভাষাগতভাবে এর অর্থ দাঁড়ায়– ইহজগৎ, বর্তমান দুনিয়া ও ইহজীবন সম্পর্কিত বিষয়াদি।

সেকুলারিজম এমন এক সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন যা মানবজাতির ইহজাগতিক কল্যাণ চিন্তার উপর গড়ে উঠেছে। এর আওতাধীন বিষয়গুলো ইহজগতের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষা করা সম্ভব। মানবরচিত এ মতবাদ ইহজগতের বাইরে পরজগৎ নিয়ে মাথা ঘামায় না। এ মতবাদ 'ওহির' নাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান অস্বীকার করে, ধর্মকে অস্পষ্ট, অপূর্ণ, অনির্ভরযোগ্য ও অবিশ্বাস্য মনে করে। এ মতাদর্শ মানুষের সামষ্টিক ব্যাপারও শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মকে কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট করতে রাজি নয়। এ মতবাদ সৃষ্টিকর্তা ও পরকাল স্বীকার করে না– অন্যকথায় সেকুলারিজম তথা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ হলো– এমন এক সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন যা ধর্মবিশ্বাসকে নাকচ করে দেয়।

বি. দ্র. সেকুলারিজমের উদ্ভব, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ইত্যাদি নবম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমন

সেকুলারিজমের উদ্ভব হয় খ্রিস্টীয় সমাজে রেনসাঁযুগে ইউরোপে। খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া (Reaction) হিসেবে সেকুলারিজমের জন্ম। যেহেতু সেকুলারিজমের জন্মের পশ্চাতে (Background) ধর্মযাজকদের কার্যকলাপ জড়িত তাই প্রাসঙ্গিকভাবে খ্রিস্টধর্ম ও যাজকদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হচ্ছে।

খ্রিস্টীয় বা ঈসায়ী সাল হযরত ঈসা (আ.) এর জন্মের বছর থেকে গণনা করা হয়। হযরত ঈসা (আ.) এর জন্ম হয় ফিলিস্তিনের বেথেলহামে। তার মায়ের নাম মারিয়ম (Mary)। মারিয়মের পিতামাতা অত্যন্ত ধার্মিক, খোদাভীরু ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। মারিয়ামের মা হান্না গর্ভকালীন অবস্থায় আল্লাহকে উদ্দেশ করে বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক, আমার গর্ভে যা আছে তা একান্ত আপনার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম। সে আপনার কাজে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত থাকবে। আপনি কবুল করুন। আপনি শোনেন ও জানেন।'

(সূরা : আলে ইমরান, আয়াত-৩৫)

মারিয়ামের জন্ম লাভের পর তাঁর মা বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক, আমি কন্যা সন্তান প্রসব করেছি। ...আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে তাঁর ও তাঁর বংশধরদের জন্য আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

(সূরা : আলে ইমরান, আয়াত-৩৬)

হযরত জাকারিয়া (আ.) ছিলেন আল্লাহর নবী। তিনি জেরুসালেমের বায়তুল মাকদিসের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি মারিয়ামের আপন খালু হন। মারিয়াম জাকারিয়া (আ.) এর তত্ত্বাবধানে একটি কামরায় প্রতিপালিত হচ্ছিলেন এবং এবাদতের মাধ্যমে দিনযাপন করছিলেন। তিনি যখন পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্তা। এ সময় একদিন একদল ফেরেশতা তাঁর সম্মুখে এলেন এবং তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, 'হে মারিয়াম– আল্লাহ তোমাকে উচ্চসম্মানে মহিমান্বিত করেছেন, পবিত্রতা দান করেছেন এবং সমগ্র পৃথিবীর মহিলাদের উপর তোমার প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করে তোমাকে তার নিজের কাজের জন্য বাছাই করেছেন। হে মারিয়াম, আল্লাহ

www.nagorikpathagar.org

তোমাকে তাঁর এক 'বাণীর' সুসংবাদ দিচ্ছেন। তাঁর নাম হবে 'ঈসা বিন মারিয়াম'। ইহ ও পরকালে তিনি হবেন সম্মানিত। তাঁকে আল্লাহতায়ালার নিকটবর্তী বান্দাদের মধ্যে গণ্য করা হবে। তিনি দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবেন। তিনি হবেন পুণ্যবানদের একজন। আল্লাহ তাঁকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জিলের জ্ঞান দান করবেন। (সূরা : আলে ইমরান, আয়াত-৪২, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৪৯) তাঁকে বনি-ইসরাইলদের জন্য স্বীয় রসুল হিসেবে প্রেরণ করবেন।' মারিয়াম বললেন, 'আমার সন্তান হবে কিভাবে? আমাকে তো কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি, আর আমি কোনো চরিত্রহীনা নারীও নই।' ফেরেশতা জবাব দিলেন, 'এভাবেই হবে। এ রকম করা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ কাজ। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কিছু স্থির করেন, তখন বলেন, 'হও'– অমনি তা হয়ে যায়। আর এটা করা হবে এ উদ্দেশ্যে যে, এ পুত্রকে মানুষের জন্য একটা নিদর্শন ও রহমত বানানো হবে।' (সূরা : মারিয়াম, আয়াত-২০, ২১)

মারিয়ামের গর্ভে ঈসা (আ.) এর ভ্রুণ সঞ্চার হলো। তিনি বায়তুল মাকদিসে তাঁর অবস্থান থেকে একটু দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। একপর্যায়ে প্রসব বেদনা উঠলে তিনি একটি খেজুর গাছের নিচে আশ্রয় নিলেন। তিনি আক্ষেপ করে বললেন, 'হায় আমি যদি এর পূর্বে মরে যেতাম, আর আমার নাম-নিশানাও পর্যন্ত না থাকত।' (সূরা : মারিয়াম, আয়াত-২৩)। এ সময় ফেরেশতা তাঁকে ডেকে বললেন, 'চিন্তা করো না, তোমার প্রতিপালক তোমার জন্য এক ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দিয়েছেন। আর তুমি খেজুর গাছের কা- ধরে নাড়া দাও। তোমার উপর তাজা পাকা খেজুর টপটপ করে পড়বে। তুমি তা খাও, পান কর, আর তোমার চোখ ঠা-া কর। তুমি কোনো লোক দেখলে বলবে, 'আমি রাহমানের জন্য রোজার মানত করেছি। এ কারণে আমি কারো সাথে কথা বলব না।' (সূরা : মারিয়াম, আয়াত ২৪, ২৫ ও ২৬)

অতঃপর মারিয়াম সন্তান নিয়ে নিজের জাতির লোকদের নিকট এলেন। লোকেরা তাঁকে বলল, 'হে মারিয়াম, তুমি তো বড় পাপের কাজ করে বসেছ। তোমার পিতা কোনো খারাপ লোক ছিলেন না, আর তোমার মা ও চরিত্রহীনা ছিলেন না।' (সূরা : মারিয়াম, আয়াত ২৭ ও ২৮)। মারিয়াম বাচ্চার দিকে ইশারা করলেন। লোকেরা বলল, 'তার সাথে কি কথা বলব। সে তো দোলনায় শায়িত এক শিশুমাত্র।' এ মুহূর্তে শিশু ঈসা (আ.) বলে উঠলেন, 'আমি আল্লাহর বান্দাহ। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন। তিনি আমাকে

www.nagorikpathagar.org

বরকতওয়ালা বানিয়েছেন। তিনি আমাকে আমরণ সালাত ও জাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ আমাকে মায়ের হক আদায়কারী বানিয়েছেন। তিনি আমাকে স্বৈরাচারী ও হতভাগা বানান নাই। আল্লাহ আমার প্রতিপালক, তোমাদেরও প্রতিপালক। অতএব তাঁরই এবাদত কর। এটাই সহজ-সরল পথ।' (সূরা : মারিয়াম, আয়াত ২৯, ৩০, ৩১, ৩২ ও সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ৫১)। শিশু ঈসা (আ.) এর কথা শুনে সবাই থ হয়ে গেল। সবাই উপলব্ধি করল, এ কোনো সাধারণ শিশু নয়, এ শিশু আল্লাহতায়ালার এক নিদর্শন- খাস মাজেযা। আর তার মাও পবিত্র, সম্মানিতা ও মর্যাদাশীল মহিলা। তিনি চরিত্রহীনা নন।

'আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মতো। আল্লাহ আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করে নির্দেশ দেন- 'হও'। অমনি সে হয়ে যায়।'

(সূরা : আলে-ইমরান, আয়াত-৫৯)

কালক্রমে ঈসা বিন মারিয়াম উপযুক্ত হয়ে উঠলেন। আল্লাহ তাঁকে রসুল নিযুক্ত করলেন, আর তাঁর উপর আসমানি কিতাব 'ইঞ্জিল' নাজিল হলো। তিনি বনি ইসরাইলের জন্য নবী নিযুক্ত হলেন।

ঐ সময় ইহুদিদের সার্বিক অবস্থা কী রকম ছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো :

ঐ সময় ইহুদি সমাজ ছিল শতধা বিচ্ছিন্ন। বিচ্ছিন্ন অংশসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই থাকতো। এর আগে তাদের উপর গোলামির অভিশাপ আপতিত হয়। ঈসা (আ.)-এর জন্মের ৭৩৮ বছর আগে আসুরীয়রা তাদেরকে পদানত করে। অতঃপর খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে ব্যাবিলিয়রা ফিলিস্তিন দখল করে এবং ২০০ বছর গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ রাখে। তারপর ইহুদিরা পারস্য (ইরান) সাম্রাজ্যের অধীনে চলে যায়। খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৪ থেকে ৩২৩ অব্দ পর্যন্ত তারা গ্রিক বীর আলেকজণ্ডারের অধীনস্থ হয়। পরবর্তীতে তারা মিশরের টলেমি (Ptolemies) শাসকদের তাঁবেদার হয়। খ্রিস্টপূর্ব ১৯৮ সালে ইহুদিরা গ্রিক রাজবংশ স্লুকডিয়ার (Scloucaedea) অধীনে চলে যায়। গ্রিকরা তাদেরকে মূর্তিপূজা করতে বাধ্য করে। এ সময় ইহুদিদের সামান্য হুঁশ হয়। তারা অধিকার সচেতন হয়। ঈসা (আ.)-এর জন্মের ১১৪ বছর আগে তারা লড়াই করে স্বাধীনতা লাভ করে।

কিন্তু খাসলত তাদের বদলায়নি। তাদের নিজেদের মধ্যে শুরু হয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অভ্যন্তরীণ কোন্দল, যার ফলশ্রুতিতে তাদের একাংশের আমন্ত্রণে খ্রিস্টপূর্ব ৬০

www.nagorikpathagar.org

সালে রোম সম্রাট ফিলিস্তিন দখল করে নেন।

আলোচিত কোনো এক সময় প্রথম কেবলা বায়তুল মাকদিসে মূর্তি ঢুকানো হয়। তাদের অনুষ্ঠানাদি ও পূজা-পার্বণে মদ, জুয়া, নাচ, গান ইত্যাদি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়। তখন ব্যাপক আকারে ঘুষের প্রচলন হয়। আদালতের রায় নিজের পক্ষে আনার জন্য ঘুষ প্রদান স্বাভাবিক বিষয়ে পরণত হয়। তারা আল্লাহর নবী হযরত ওজায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র হিসেবে ঘোষণা করে এবং তাঁর মূর্তি বানিয়ে পূজা আরম্ভ করে, আবার অন্যদিকে বহু সংখ্যক নবীকে অকারণে হত্যা করে। হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের পর গেলিলের শাসনকর্তা হিরোডিস এক নর্তকীকে খুশি করার জন্য হযরত ইয়াহইয়া (আ.) (John the Baptist, খ্রিস্টানদের দেয়া নাম) কে হত্যা করায়। তাদের স্পর্ধা এতদূর ছাড়িয়ে যায় যে, তারা প্রচার করে আল্লাহ্ ধুলার ধরায় নেমে আসতে বাধ্য হয়েছেন এবং তাদের জাতীয় বীরের সাথে মল্লযুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়েছেন।

প্রখ্যাত হাদিসগ্রন্থ তিরমিযী শরীফে উল্লেখ আছে– রসুল (সা.)-এর বয়ান– হযরত মুসা (আ.)-এর ইন্তেকালের আগে ইহুদিরা তাঁর কাছে দাবি করেছিল– 'আমাদের জন্য একটি মূর্তি বানানোর অনুমতি দাও যেমনি তাদের (প্রতিবেশী জাতিসমূহের) প্রতিমা আছে।'

ইহুদিদের চারিত্রিক ও নৈতিক অধঃপতনের এ রকম যুগসন্ধিক্ষণে হযরত ঈসা (আ.) নবুওয়তপ্রাপ্ত হয়ে তাদের কাছে দ্বীনের (ধর্মের) দাওয়াতি কাজ শুরু করলেন। তিনি বনি ইসরাইলকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের সামনে মাটি দিয়ে পাখির প্রতিকৃতি বানাই, আর উহাতে ফুঁক দিই, উহা আল্লাহর নির্দেশে জীবন্ত পাখি হয়ে যায়। আমি আল্লাহর নির্দেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভালো করে দিই। মৃতকে জীবন্ত করি। আমি তোমাদেরকে বলে দেব, তোমরা কি খাবে আর গৃহে কি সঞ্চয় করে রাখবে। এতে তোমাদের জন্য যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা ঈমান আনতে প্রস্তুত হও। আমার সম্মুখে তাওরাত ও যাবুরের যে শিক্ষা ও হেদায়াতের বাণী মওজুদ আছে, আমি তার সত্যতা প্রমাণকারী হিসেবে এসেছি। মুসা (আ.) ও দাউদ (আ.) এর মৃত্যুর পর স্বার্থপর কিছু লোক তোমাদের যা হারাম করে দিয়েছে, আমি তা হালাল করতে এসেছি। আমি আল্লাহর তরফ থেকে তোমাদের জন্য নিদর্শন নিয়ে এসেছি। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক, তোমাদেরও প্রতিপালক। তোমরা তাঁরই দাসত্ব কর। এটাই সঠিক ও সরল পথ।'

www.nagorikpathagar.org

ঈসা (আ.) কে আরো পরীক্ষা করার জন্য শ্রোতারা তাঁকে বলল, 'হে মারিয়াম পুত্র ঈসা, আপনার প্রতিপালক আসমান থেকে খাদ্য ভরা একটি পাত্র কি আমাদের জন্য নাজিল করতে পারেন? ঈসা (আ.) জবাবে বললেন, 'আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।' তারা বলল, 'আমরা শুধু এটাই চাই যে, সে পাত্র থেকে আমরা খাদ্য গ্রহণ করব এবং আমাদের হৃদয় শান্ত ও পরিতৃপ্ত হবে। আর আমরা জানতে পারব যে, আপনি সত্য বলেছেন। আমরা এ ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকব'। এ সময় ঈসা ইবনে মারিয়াম দোয়া করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক, আমাদের প্রতি আসমান থেকে একটি খাদ্যভরা পাত্র নাজিল কর, যা খুশি ও আনন্দের উপলক্ষ হবে এবং হবে তোমার পক্ষ থেকে একটি নির্দশন। আমাদেরকে জীবিকা দান কর, তুমিই তো শ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা।'

(সূরা : মায়েদা, আয়াত ১১২, ১১৩ ও ১১৪)

আল্লাহ উত্তরে বললেন, 'আমি তোমাদের প্রতি তা নাজিল করব, কিন্তু অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে কুফরি করবে, তাকে এমন শাস্তি দেব যা দুনিয়াতে আর কাউকে দেইনি।' (সূরা : মায়েদা, আয়াত ১১৫)

(বি. দ্র. উপরোক্ত তথ্যগুলো আল-কুরআনের সূরা আলে-ইমরান, সূরা মায়েদা ও সূরা মারিয়াম থেকে গৃহীত)।

ঈসা (আ.) ত্রিশ বছর বয়সে নবুওয়তপ্রাপ্ত হন। প্রায় তিন বছর তিনি বনি ইসরাইলদের মধ্যে ধর্ম প্রচার করেন। তিনি তাদেরকে তাঁর উপর নাজিলকৃত আসমানি কিতাব ইঞ্জিলের বাণী শোনান। মাঝে-মধ্যে নিদর্শন (মাজেযা) দেখাতে থাকেন। তাঁর দাওয়াতে কিছু লোক ঈমান আনল, আরো কিছু লোক তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী হয়ে থাকলো। আল-কুরআনে তাদেরকে 'হাওয়ারি' বলা হয়েছে।

ঈসা (আ.) আল্লাহর বাণী প্রচার করতে থাকলেন। তাঁর প্রচারে ইহুদি স্বার্থান্বেষী ভণ্ড আলেমদের কায়েমি স্বার্থে আঘাত লাগল। তাঁকে অবাধে ধর্মপ্রচার করতে দিলে তাদের ভণ্ডামি জনগণের কাছে ধরা পড়বে, ফলে তাদের ধর্মব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে, এ ভয়ে তারা ঈসা (আ.)-এর চরম বিরোধিতা আরম্ভ করল। তারা ফিলিস্তিনের রোম সম্রাটের প্রতিনিধি গভর্নর পন্টিয়াস পিলেট (Pontious Pilate) এর কাছে অভিযোগ পেশ করল যে, ঈসা একজন ধর্ম ও রাজদ্রোহী ব্যক্তি। তাকে অবাধে ধর্মপ্রচার করার সুযোগ দিলে, সে সমস্ত লোকজনকে বিভ্রান্ত করে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বিদ্রোহ ঘটাবে। ফলে রাজ্য ও ধর্ম উভয় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই ধর্ম ও রাজদ্রোহীকে দমাতে হলে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হওয়া

www.nagorikpathagar.org

দরকার।

গভর্নর পন্টিয়াস পিলেট তাদের আরজি শুনে তাদের কথামতো ঈসা (আ.) এর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রদান করলেন। ঐ সময় শূলে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতো। দণ্ডাদেশ শুনে ইহুদি স্বার্থপর আলেমরা খুশিতে বাগ-বাগ হয়ে ঈসা (আ.) কে ধরার জন্য চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ঈসা (আ.)-এর কাছে এ খবর পৌঁছলে তিনি আত্মগোপন করলেন। এ সময় তাঁরই এক সঙ্গী বিশ্বাসঘাতক 'ইসকেরিয়াত' (জুডাস এসকোরিয়ট) ঘুষ গ্রহণ করে ঈসা (আ.)-কে ধরিয়ে দিল।

ঈসা (আ.) একটি নিরালা জায়গায় হাওয়ারি (সঙ্গী) বেষ্টিত ছিলেন। আল্লাহতায়ালা তাঁকে জীবিতাবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নিলেন। এ সময় বিশ্বাসঘাতক ইসকেরিয়াতের চেহারা অবিকল ঈসা (আ.)-এর চেহারার মতো হয়ে গেল। বোকার দল তাকেই ঈসা (আ.) মনে করে শূলে চড়িয়ে বধ করল।

সূরা আলে ইমরানের ৫৫ নং আয়াতে উল্লেখ আছে 'স্মরণ কর যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা আমি তোমার কাল পূর্ণ করেছি এবং আমার নিকট তোমাকে তুলে নিচ্ছি।'

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়

খ্রিস্টপূর্ব ইউরোপের ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থা

ফিলিস্তিনে ধর্মীয় কায়েমি স্বার্থবাদী ইহুদি আলেমদের কারণে ঈসা (আ.) এর নিরাপত্তা বিনষ্ট হয়। তাঁর দাওয়াত কবুলকারী সঙ্গীগণ (হাওয়ারি) এখানে অবস্থান করা নিরাপদ নয় চিন্তা করে ইহুদি আলেমচক্র ও ফিলিস্তিনের রাজশক্তির আওতার বাইরে গিয়ে ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করেন। তারা ভূমধ্যসাগরের উভয় তীরে একদিকে সিরিয়া, ইরাক ও মিশরে, অন্যদিকে গ্রিস ও রোম হয়ে ইউরোপের পথে ধাবিত হন।

মিশর, সিরিয়া ও ইরাক অঞ্চলে আল্লাহর বহু নবী এসেছিলেন। নবুওয়ত ও আসমানি কিতাবের ব্যাপারে তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। হযরত ঈসা (আ.) বনি ইসরাইল কওমের জন্য নবী হয়ে এসেছেন– এতদঅঞ্চলের জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। তাই বনি ইসরাইল কওমের বাইরে অন্যান্য জনগণের মধ্যে ঈসা (আ.) এর সঙ্গীগণ খুব সুবিধা করতে পারেননি। অন্যদিকে গ্রিস ও রোমের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

গ্রিস ও রোমসহ সমগ্র ইউরোপের বাসিন্দারা Paganism এ বিশ্বাসী ছিল। তারা নানা দেব-দেবী, ভূত, পেতনী, পরী, ডাইনি ইত্যাদির অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। তারা এদের করুণা লাভের উদ্দেশ্যে অথবা এদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য কারো মূর্তি বানিয়ে, আবার কাউকে অশরীরী কল্পনা করে পূজা করত। পূজার স্থলে মন্দির গড়ে তোলা হতো। মন্দিরে উপস্থিত হয়ে সামষ্টিকভাবে পূজা করা হতো। তারা মোমবাতি জ্বালিয়ে দেব-দেবীর নিকট থেকে মঙ্গল আরাধনা করত। ক্ষতিকর অশরীরী আত্মাকে তাড়িয়ে দেবার জন্য মাঠে একত্রিত হয়ে আতশবাজি পোড়াত। পূজা অনুষ্ঠান উৎসবে পরিণত হতো। মদ, জুয়া, পাশা খেলা, নাচগান, ব্যভিচার ইত্যাদি পূজা অনুষ্ঠানের সহচর ছিল। এ সময় আনন্দ স্ফূর্তির বন্যা বয়ে যেত। মন্দিরে খাচায় আবদ্ধ বাঘ, সিংহ রাখা হতো। এদের খোরাক হিসেবে তাদের ভাষায় 'অপরাধীদেরকে' খাঁচায় ঢুকিয়ে দেয়া হতো। পশুরা জীবিত মানুষকে ছিঁড়ে ফেড়ে ভক্ষণ করত। আর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পূজারী তা স্বচক্ষে অবলোকন করে হাততালি দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করত।

R.C. Chelmers তাঁর লিখিত 'The Heritage of Western Culture' বইতে উল্লেখ করেন, 'গ্রিক ধর্মে ক্রিড়া প্রতিযোগিতা, ভূরিভোজ ও নাচ ধর্মীয় আচারের পাশাপাশি সমান তালে চলতে দেখা যায়। ...ডায়নিসাস হলেন তাদের মদ্যপানের দেবতা। এ দেবতার পূজা করার সময় তারা প্রচুর মদপান করত। ফলে মদপান তাদের ধর্মের অংশ হয়ে যায়।

পরকাল সম্পর্কে তাদের মনে ভয়-ভীতি, অনিশ্চয়তা ও আতঙ্ক বিরাজ করত।

www.nagorikpathagar.org

গ্রিক বীর একিলিসের উক্তি, 'মৃত ব্যক্তিদের রাজা হবার পরিবর্তে আমি বরং ইহজগতে একজন স্বল্প আয়ের ভূমিহীন দিনমজুর হিসেবে বসবাস করাকে অগ্রাধিকার প্রদান করি। (Odyssy page-489)

গ্রিকরা তাদের অতীতকালের বীরদের দেবতা বানিয়ে পূজা করত। Encyclopedia of Religion & Ethics এর ষষ্ঠ Volume এ উল্লেখ আছে- 'অতীতে কিছু সংখ্যক বীর যারা প্রাচীন যুদ্ধ নায়ক হিসেবে বহুকাল শ্রদ্ধা কুড়িয়েছে, তারা দেবতার মর্যাদা পেয়েছে।'

Encyclopedia এর একই Volume এ আরো উল্লেখ আছে- 'গ্রিক দেবতা এপলো লাইকিউস আরগোসের মন্দিরে রাখা হয় আগুনের 'শিখা-চিরন্তন'। এ অগ্নিশিখা সদাসর্বদা জ্বালিয়ে রাখা হতো। চিরন্তন জীবনের প্রতীক হিসেবে 'শিখা চিরন্তনের' সংরক্ষণ ও পূজা হত।'

রোমান ধর্ম ছিল অনেকগুলো কুসংস্কারের জগাখিচুড়ি। Warde Fowler এর মতে রোমান ধর্মীয় ইতিহাস শুরু হয়- প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ, পাথর, বৃক্ষ ও জন্তু-জানোয়ার যথা মাদারউলফ, কাঠঠোকরা ইত্যাদির পূঁজার মাধ্যমে। রোমানদের প্রাথমিক যুগে পুরোহিত ও শাসকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। তারা বিশ্বাস করত রাজার সাথে স্বর্গীয় দেবতার বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রাচীন রোমের সম্রাটদের মধ্যে তিনজন ছিলেন ইতালি ও গ্রিসের নাগরিক। তাদের রাজত্বকালে ইতালি ও গ্রিক উপাসনা পদ্ধতি, সাথে জমকালো উৎসব আয়োজনের রেওয়াজ রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু হয়। The Dawn of European Civilization এর লেখক Hartwall Jones তাঁর বইতে উল্লেখ করেন- 'রোমানদের World Spirit এ আছে- কৃষির দেবতা স্যাটার্ন, গৃহের দেবি ভেসতা, পানি ও ঝর্ণায় বসবাসকারী পরীগণ, যাদুমন্ত্রের দেবদেবী, বজ্রপাত, মৃত্যু ও ধ্বংসের দেবতা এবং মৃত ব্যক্তিদের প্রেতাত্মা মানুষের সুখের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তোলে।'

তখনকার রোমান বুদ্ধিজীবীরা আবার 'আত্মার অবিনশ্বরতায়' বিশ্বাসী ছিল না। তাদের বক্তব্যের সারমর্শ- 'মৃত্যু আমাদের বিচলিত করে না। কেননা আত্মা নশ্বর। আমাদের কাছে মৃত্যু কিছুই না। যা ক্ষয় হয়ে যায় তার কোনো অনুভূতি থাকে না। আর যার কোনো অনুভূতি নাই, তা আমাদের কাছে কিছুই না।'

এ সময় রোমান সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের যে নৈতিক অবস্থা ছিল, তার বর্ণনা পাওয়া যায় William Hartpole Leeckey'র লেখায়। তার History of European Morals বইয়ের বর্ণনা-

'নাগরিকরা দেখত যে, আয়-রোজগারের সম্মানজনক ক্ষেত্রগুলো রয়েছে দাসদের দখলে। অভিজাত শ্রেণীর লোকরা ব্যবসা-বাণিজ্যকে তীব্রভাবে ঘৃণা করত। ফলে অভিনেতা, মূক অভিনেতা, ভাড়াটে মল্লযোদ্ধা, রাজনৈতিক গোয়েন্দা, রিপুর সেবক, ধর্মীয় প্রতারক, নকল দার্শনিক ইত্যাদি দুর্নীতিযুক্ত পেশায় তাদের অনেকেই অংশগ্রহণ করে। এতে করে মুক্ত ব্যক্তিরা অনিশ্চিত, সাময়িক আয়-রোজগারের উপায় খুঁজে পায়। তাদের মক্কেলও জোটে নানান ধরনের। প্রত্যেক ধনীলোকের অর্থে পালিত হয় আরো অনেক লোক। এরা ধনীদের তোষামোদকারী ও ইন্দ্রিয়ের সেবকরূপে ভূমিকা পালন করত।'

www.nagorikpathagar.org

একই বইয়ে লেখক দাসদের সম্পর্কে লেখেন– 'দাস শ্রেণী ছিল পাপাচারের আখড়া। তাদের নারী-পুরুষ যারা অভিজাত শ্রেণীর শ্রান্ত কামুক ইন্দ্রিয়কে চাঙ্গা করে তুলতে পারত, তারা প্রতিটি পরিবারের ভূষণ হয়ে থাকত। বিয়ের প্রতি অনীহা ব্যাপকতা লাভ করে। অবিবাহিত ধনীদের সম্পদের উত্তরাধিকারলিপ্সু ও তোষামোদকারী লোকদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। তারা খেলাধুলায় আসক্ত হয়ে পড়ে। পাবলিক গোসলখানা ও সাঁতারকাটার স্থানগুলোতে কর্মবিমুখ লোকদের ভিড় লেগেই থাকত। বস্তুত আলস্য, স্ফূর্তি ও রোজগারের একটি মামুলি উপায় ছিল রোমানদের কাম্য। ধনীদের মধ্যে ভ্রূণ হত্যা এবং সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে শিশুহত্যার প্রচলন তাদের ধ্বংসকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।'

একই বইয়ের ২৬ পৃষ্ঠায় W.EH. Leeckey আরো লেখেন– 'শিশু হত্যা গ্রিকদের মাঝেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। প্লেটো ও এরিস্টটলের 'সর্বোচ্চ সুখ' মতবাদের প্রভাব, লাইকারগাস ও সলোনের আইনের ফলে শিশু হত্যা বৈধতা লাভ করে। লোকেরা ভাবে যে, সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা দরকার এবং যতদূর সম্ভব রাষ্ট্র অনুৎপাদনশীল ব্যক্তিদের ভারমুক্ত হওয়া প্রয়োজন। তাই তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, শিশুদের বিশেষ করে পঙ্গু ও ব্যাধিগ্রস্ত শিশুদের কষ্ট না দিয়ে হত্যা করা একটি সামাজিক কল্যাণ।'

কবি 'এস্কিলাসের' একটি কবিতার কয়েকটি লাইনে তখনকার অবস্থা ফুটে ওঠে এভাবে :

একের পর এক ভেঙে পড়া ঢেউগুলোর মধ্যে
এক আর্তনাদ, এক কান্না,
মৃত্যুর গুহা থেকে ভেসে আসে বিলাপ।
পবিত্র নদীর ফোয়ারাগুলো
মনোবেদনা ও দুঃখ বেদনার কাতরতা নিয়ে
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

তথ্যসূত্র :

1. Warde Fowler : The Religious Experience of Roman People, Macmillan, London 1933.
2. G. Hartweel Jones. The Dawn of European Civilization, London 1903.
3. Willium Edward Hartpole Leckey : History of European Morals, Longman Green & Co. 1910

www.nagorikpathagar.org

ইউরোপে খ্রিস্ট ধর্ম

পূর্বে উল্লেখিত পরিবেশে ঈসা (আ.) এর সঙ্গীগণ গ্রিস ও রোমে আগমন করেন। তারা খুবই সাবধানতা অবলম্বন করেন যাতে রাজশক্তি তাদের অবস্থান জানতে না পারে। অর্থাৎ Underground পদ্ধতিতে সংগোপনে তারা বঞ্চিত, অবহেলিত, অসহায়, গরিব ও দাস শ্রেণীর লোকদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন।

ঈসা (আ.) এর যে সাথীরা গ্রিস ও রোমে ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন, তারা বিদ্যমান পরিবেশ ও পরিস্থিতি সামনে রেখে হেকমত খাটাতে গিয়ে ঈসা (আ.)-এর আনীত ধর্মে কিছু গ্রহণ ও কিছু বর্জনের মাধ্যমে ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন। একজন যাজকীয় ইতিহাসবিদ খ্রিস্টধর্মের মিশ্রণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'একটি স্বচ্ছ বিশুদ্ধ ঝর্ণাধারা স্বর্গীয় কুয়াশা বিন্দুতে ভরপুর নালা থেকে পানি সঞ্চিত হয়ে কালক্রমে একটি নদীর রূপ নিয়ে যখন দীর্ঘ ও আঁকা-বাঁকা পথে অগ্রসর হয়, তখন যে মাটির উপর দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়, সে মাটির রং স্রোতে মিশে যায়।' অর্থাৎ ঝর্ণার মূল পানির সাথে বহু জিনিস মিশে পানি তার মৌলিকত্ব হারিয়ে ফেলে।

অবস্থা হয়ে যায় তাই। ধর্মপ্রচারকগণ খ্রিস্টধর্মকে সন্ন্যাস, বৈরাগ্য ও ত্যাগের ধর্ম হিসেবে মানুষের সামনে পেশ করেন। তারা সমগ্র মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে একটিমাত্র বিষয়ের প্রতি আর তা হলো– কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে অনায়াসে আসমানি সাম্রাজ্যে প্রবেশ করা যাবে। তারা প্রচার করে– 'যদি আসমানি সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে চাও তবে ইহজগতের সবকিছু পরিত্যাগ কর।'

তারা আল্লাহ প্রেরিত ঈসা (আ.) এর উপর নাজিলকৃত আসমানি কিতাব ইঞ্জিলকে বিকৃত করে তাদের মর্জিমত গ্রিক ভাষায় বাইবেল রচনা করে। বাইবেলের মাধ্যমে তারা যে বিষয়টি ফোকাস (Focus) করে তার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

'যদি কেউ আমার কাছে আসে এবং সে নিজের বাপ-মা, স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বোনকে এমনকি নিজের প্রাণকে পর্যন্ত ঘৃণা করতে না পারে, সে আমার শিষ্য হতে পারবে না। (লুক : ১৪ : ২৬)

www.nagorikpathagar.org

'তুমি যদি পূর্ণতা লাভ করতে চাও তবে যাও– নিজের সমস্ত মালপত্র বিক্রি করে গরিবদের মধ্যে বিতরণ করে দাও এবং আমার অনুগত হও। তাহলে তুমি আকাশে ভাণ্ডার পাবে।' (মথি ১৯ : ২১)

'পৃথিবীতে নিজের জন্য সম্পদ পুঞ্জীভূত করো না। কেননা এখানে সম্পদ পোকায় খায় জং ধরে... সম্পদ আকাশে পুঞ্জীভূত কর।' (মথি : ১৬ : ১৯)

'আমি তোমাদের বলি– নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ কর। কী খাব, কী পান করব, কী পরব এ ভাবনায় পড় না...

... আকাশের পাখিদের দেখ– তারা ফসল বোনে না, সম্পদ জমা করে না, তথাপি আসমানের পিতা তাদেরকে খাওয়ান... জঙ্গলের শোষণ গাছের দিকে তাকাও, দেখ কিভাবে তার বিকাশ ও বৃদ্ধি হয়। তারা পরিশ্রম করে না, সুতাও কাটে না– যে গাছ আজ জঙ্গলে আছে, কাল চুলায় যাবে, তাকে যখন আসমানি পিতা পোশাক পরান– তখন হে দুর্বলচিত্ত লোকেরা, আসমানি পিতা তোমাদেরকেও পোশাক পরাবেন।' (মথি ৬ : ২৫-৩১)

বাইবেলের এ জাতীয় বাণীসমূহ তাদেরকে বৈরাগ্যবাদ অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করে।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক H.A.L. Fisher তাঁর সুবিখ্যাত History of Europe গ্রন্থে প্রাথমিক যুগের খ্রিস্ট ধর্মপ্রচারকের বক্তব্য এভাবে তুলে ধরেন :

'এ জগৎ একটা দুষ্টগ্রহ, মানবতা-স্বর্গভ্রষ্ট। এ দুষ্টগ্রহ চিরকাল টিকে থাকবে না। যীশুর দ্বিতীয় আবির্ভাবের সময় আসন্ন, তা বিলম্বিত হবার কোনো কারণ নেই। পৃথিবীতে সত্যের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। সকল ত্রুটি, অন্যায় ও মানুষের নৈতিক ঘাটতি মুছে যাবে। প্রতিটি মানবাত্মা বর্তমানে ভয়ানক সমস্যার সম্মুখীন। কিভাবে অশেষ যন্ত্রণা থেকে নাজাত লাভ করা যায়, তার সাধনা করতে হবে। এ যন্ত্রণা মানুষকে উচিত শাস্তি হিসেবে ঈশ্বর দিয়েছেন স্বর্গোদ্যানে আদমের আদি পাপের জন্য... ইত্যাদি।'

এ সময় খ্রিস্টান সাধুদের মগজে হেলেনিক চিন্তা অনুপ্রবেশ করে। আত্মা ও বস্তুর পৃথকীকরণ হলো হেলেনিজমের অন্যতম ধারণা। এ মতবাদ আত্মাকে ভালো ও বস্তুকে মন্দ জিনিস মনে করে। তাদের লক্ষ্য হলো সাধনার মাধ্যমে মন্দ দেহ থেকে আত্মাকে মুক্ত করে নিষ্কৃতি লাভ করা। খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের এ সমস্ত প্রচারণা ইউরোপের এ অংশে জনপ্রিয় হয়। ফলে আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন পরিহার করে মঠকেন্দ্রিক জীবন গড়ার এক আন্দোলন সৃষ্টি হয় এবং খ্রিস্টধর্ম সমান গতিতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

এ সময় নবদীক্ষিত খ্রিস্টানদের উপর বৈরাগ্যবাদ কিভাবে আছর করেছিল– কিভাবে তারা পরিবার-পরিজন পরিত্যাগ করে মঠজীবন বেছে নিয়েছিল তার

www.nagorikpathagar.org

বর্ণনা ইউরোপের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদদের কালোত্তীর্ণ ইতিহাস গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। আমরা এ পর্যায়ে W.E.H. Leeckey'র রচিত বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ History of European Morals থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি :

'চতুর্থ শতকের গোড়ার দিকে সেন্ট পেখোমিয়াস তার অধীনে সাত হাজার মঠবাসী জড়ো করেন। সেন্ট জেরোম-এর অধীনে ইস্টার উৎসবে পঞ্চাশ হাজার মঠবাসী একত্রিত হয়। নিট্রিয়ার একজন এবোটের অধীনে ছিল পাঁচ হাজার মঠবাসী'। মঠবাসীদের জীবনযাপন প্রণালী সম্পর্কে W.E.H. Leeckey লেখেন– 'সেন্ট জেরোম সপ্রশংস ঘোষণা করেন যে, তিনি এক মঠবাসীকে ত্রিশ বছর যাবৎ প্রতিদিন একখণ্ড যবের রুটি ও সামান্য পরিমাণ ঘোলাপানি খেয়ে জীবনযাপন করতে দেখেছেন। ২য় একজনকে একটি গর্তে বাস করতে এবং প্রতিদিন পাঁচটি ডুমুর খেয়ে জীবন ধারণ করতে দেখেছেন। ৩য় একজন কেবল ইস্টার সানডেতে বছরে একবার তার চুল কাটত, ময়লা কাপড়চোপড় পরত, পরনের পোশাক ছিন্নভিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তা খুলতো না, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা ও গায়ের চামড়া পাথরের মতো না হওয়া পর্যন্ত উপোস করত। ... সেন্ট ইউসেবিয়াস একশ পঞ্চাশ পাউন্ড লোহা শরীরে বহন করতেন। তিনি তিন বছর শুকিয়ে যাওয়া একটি কুয়ার ভেতর কাটিয়েছেন। সেন্ট বেসারিয়ান চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত কাঁটা ঝোপের মধ্যে থাকেন... সেন্ট মারসিয়ান দিনে একবার সামান্য আহার করতেন এবং সারাদিন ক্ষুধায় ছটফট করতেন। ... সেন্টজন সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি একটি পাথরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে উপাসনারত ছিলেন। উপাসনারত অবস্থায় তিনি একবারও বসেননি। প্রতি রোববার প্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত কিছু খাবার তাকে দেওয়া হতো, তা খেয়েই তিনি জীবনধারণ করতেন। কিছু সন্ন্যাসী কাপড়চোপড় ঘৃণা করতেন। তারা হামাগুড়ি দিয়ে অন্যত্র যেতেন। চুল, দাড়ি-গোঁফ ছিল তাদের শরীরের আবরণ। ... সেন্ট এথানসিয়াস সোৎসাহে বর্ণনা করতেন কিভাবে সেন্ট এনটনি বার্ধক্যকাল পর্যন্ত নিজ পা ধোয়ার পাপ করেননি। সিলভিয়া নামে এক কুমারী ষাট বছরের বৃদ্ধা হয়েও ধর্মীয় কারণে আঙুল ছাড়া আর কোনো অঙ্গ ধৌত করতে অস্বীকার করেন। সেন্ট ইউফ্রেক্সিয়া একশ ত্রিশ জন কুমারীর একটি কনভেন্টে যোগদান করেন। ওরা কোনোদিন তাদের পা ধোয়নি– গোসলের কথা শুনলে তারা আঁতকে উঠত।...

... সেন্ট জেরোম এবং আরো কয়েকজন ব্যক্তি বৈরাগ্যবাদে সহজতা আনার চেষ্টা করেন। এই কৃচ্ছ্র সাধনার ফলে বহুলোক পাগল হয়ে যেত। বহুলোক আত্মহত্যা করতো। মঠবাসীদের নির্জন কামরাগুলো কান্না, বিলাপ ও ফোঁপানির এক ভয়ঙ্কর পরিবেশ বিরাজ করত। মঠবাসীরা কাল্পনিক অশরীরী শত্রুর ভীতিতে ছিল বিহ্বল।'

www.nagorikpathagar.org

চারপাশের স্বার্থ, মায়া, মমতা ছিন্ন করাই ছিল বৈরাগ্যবাদের মূল কথা। এর প্রভাবে সংসার জীবনের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়। ফলে অসংখ্য মানুষ সংসার-ধর্ম, মা-বাপ, ছেলে-মেয়ে, পরিবার-পরিজনকে পরিত্যাগ করে আত্মার মুক্তির সাধনায় নিয়োজিত হয়। তাদের একাগ্রতা যাতে নষ্ট না হয়, এ জন্য তাঁরা এ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। 'ইভাগ্রিয়াস নির্জন সন্ন্যাস জীবনযাপন করা কালে একদিন তাঁর মা-বাবার কাছ থেকে একটি চিঠি পান। চিঠি পড়লে তার ধ্যান নষ্ট হয়ে যেতে পারে এ ভয়ে তিনি চিঠি পুড়িয়ে ফেলেন।...

মিউটিয়াস নামে এক ধনী ব্যক্তি তার সকল সম্পদ ত্যাগ করে আট বছরের ছেলেকে নিয়ে মঠে ভর্তি হন। তাকে এমন তালিম দেওয়া হয় যে, তিনি ভুলে যান যে তিনি এককালে অনেক সম্পদের মালিক ছিলেন। এবার তার ছেলেকে ভুলে যাবার দীক্ষা শুরু হয়। ছেলেকে নোংরা কাপড় পরতে দেওয়া হয়, তার সামনে ছেলের উপর চলে নানা ধরনের অত্যাচার। ছেলের চোখে অশ্রু লেগেই থাকতো, সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত– তিনি সব সহ্য করতেন। তিনি নিজের পুণ্য ও আত্মার উৎকর্ষের কথা চিন্তা করে ছেলের কথা ভুলে যেতেন। অবশেষে এবোট তাঁর ছেলেকে নদীতে ফেলে দেবার হুকুম দেয়। তিনি ছেলেক নদীতে ফেলার জন্য অগ্রসর হন। ছেলেকে নদীতে ফেলার মুহূর্তে মঠবাসীরা ছেলেকে ধরে নিয়ে যায়।

এক মায়ের সাত সন্তান মাকে ফেলে নির্জনবাসে চলে যায়। মা একবার সন্তানদেরকে দেখতে আসেন। মাকে দেখে সন্তানরা রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। বাইরে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধা কান্নায় ভেঙে পড়েন। সেন্ট পোম্যান দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলেন, 'আপনি বুড়ো মানুষ এমনভাবে কান্নাকাটি ও হা-হুতাশ কেন করছেন?' কণ্ঠ শুনে বৃদ্ধা বুঝে ফেললেন এ তার ছেলের কণ্ঠ। তিনি বললেন, 'ওহে ছেলে আমি তোমাদের এক নজর দেখতে চাই, আমাকে দেখলে তোমাদের কী ক্ষতি হবে? আমি কি তোমাদের বুকের দুধ পান করাইনি? আমি অতি বুড়ো হয়ে গেছি, তোমাদের জন্য আমার প্রাণ ছটফট করছে– সন্তানরা দরজা না খুলে জানিয়ে দিল মৃত্যুর পর তাদের সাথে দেখা হবে।'

বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি হবার আশঙ্কায় এ জাতীয় ঘটনার বিবরণ আর না বাড়িয়ে এ ব্যবস্থার উপর ঐতিহাসিকদের মতামত তুলে ধরা হচ্ছে :

ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন বলেন, 'পুরোহিতগণ সফলভাবে ধৈর্য ও ভীরুতার শিক্ষা দেয়। সক্রিয়ভাবে সামাজিক ভূমিকা পালনকে নিরুৎসাহিত করা হয়। সামরিক শৌর্য-বীর্যের অবশিষ্টাংশ কবরস্থ হয় নিভৃত প্রকোষ্ঠে। সরকারি ও বেসরকারি প্রচুর অর্থ উৎসর্গ হয় দানের নামে। সংযম, সতীত্বের গুণপনা গাইত

www.nagorikpathagar.org

যারা তাদের উপর ব্যয় হয়– সৈনিকের বেতনের প্রয়োজনীয় অর্থ। বিশ্বাস, উৎসাহ, কৌতূহল তদুপরি বিদ্বেষ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা ধর্মতাত্ত্বিক কলহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। গির্জা এমনকি রাষ্ট্র ও ধর্মীয় উপদলগুলোর কলহের কারণে হতবুদ্ধি হয়ে যেত। সম্রাটগণ যুদ্ধ-শিবিরের পরিবর্তে ধর্মীয় বিতর্ক সভার দিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হতেন। সন্ন্যাসব্রত রোমান আত্মা ও রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতার উপর আঘাত হানে।'

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে এ কথা পরিষ্কার হয় যে, বৈরাগ্যবাদ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রভূত ক্ষতি করে। আবার বৈরাগ্যবাদ সাধনার ধরণ-ধারণ ও পদ্ধতি নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য, ধর্মীয় উপদল ও কলহবিবাদের সূত্রপাত হয়। এর পরিণতি সম্পর্কে Will Durant তাঁর বই The Story of Civilization এ লেখেন– 'বৈরাগ্যবাদ মানুষকে ব্যক্তিগত নাজাতের দিকে মনোযোগী করে তোলে। রাষ্ট্রের প্রতি নিষ্ঠার মাধ্যমে যে সামষ্টিক মুক্তি অর্জন করা যায়, সেদিকে মানুষকে উদাসীন করে তোলে। এটা রাষ্ট্রের সংহতি দুর্বল করে। এ মতবাদের অনুসারীদেরকে সরকারি দায়িত্ব বা সরকারি চাকরি গ্রহণে নিরুৎসাহিত করা হতো। সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য যুদ্ধের মনোভাব সৃষ্টি করা ছিল সময়ের দাবি। অথচ তারা শান্তিকামী ও প্রতিরোধবিমুখ মানসিকতা সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত ছিল। তাই বলা যায় যে, যিশুর বিজয় ছিল রোম সাম্রাজ্যের মৃত্যুর পরোয়ানা।'

প্রাচ্যের চিন্তাবিদ আবদুল হামিদ সিদ্দিকী ইউরোপের ইতিহাস পর্যালোচনা করে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তা নিম্নে প্রদান করা হলো :

'আত্মা ও দেহের সংঘাত তত্ত্ব, গির্জা ও রাষ্ট্রের সংঘর্ষ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের উপর বড় রকমের আঘাত হানে। সৎ ও ধার্মিক লোকেরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে সরে পড়ে। ফলে সুবিধাবাদী লোকেরা অবাধে তাদের তৎপরতা চালাতে থাকে এবং তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার পথে কোনো বাধা না পেয়ে তারা আরো বেশি বেপরোয়া হয়ে ওঠে। এ অবস্থাটাই সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ গড়ে ওঠার সুযোগ করে দেয়।

... খ্রিস্টবাদ ব্যক্তিগত নৈতিকতার ক্ষেত্রে বড় রকমের বিপ্লব ঘটিয়েছে। কিন্তু তা সিজারকে (সম্রাটকে) যা ইচ্ছে তাই করার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দিয়েছে। খ্রিস্টবাদ একটি কর্মক্ষেত্র আলাদা করে নিয়ে ব্যক্তি, বিবেক, গির্জা ও গডকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই মতবাদ আধ্যাত্মিক জীবন ও পার্থিব জীবনের মাঝে যে পার্থক্য সৃষ্টি করে তা শুধু মধ্যযুগের নয় পরবর্তীকালের চিন্তাধারাকেও প্রভাবান্বিত করে।'

(আবদুল হামিদ সিদ্দিকী : পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎস-অনুবাদ অধ্যাপক এ.কে.এম

www.nagorikpathagar.org

নাজির আহমদ ।)

মানুষের একটা ফিতরত আছে। ফিতরত থেকে মানবতাকে সরিয়ে ফেললে প্রতিক্রিয়া (Reaction) হতে বাধ্য ।

আল্লাহতায়ালা মানুষের মধ্যে কিছু সহজাত প্রবৃত্তি সৃষ্টি করেছেন। এগুলোর ভারসাম্য ব্যবহারের উপর মানবসভ্যতা নির্ভর করে । এগুলোকে বাদ দিলে জীবন অচল হয়ে যায় । আবার এগুলোর বাড়াবাড়ি ব্যবহার সমাজের ভারসাম্য বিনষ্ট করে। যেমন কাম বা যৌন প্রবৃত্তি– এ প্রবৃত্তির সঠিক ব্যবহারের উপর মানবজাতির অস্তিত্ব নির্ভরশীল । আবার এ প্রবৃত্তির বাড়াবাড়ি দুনিয়ার অধিকাংশ পাপ ও অশান্তির কারণ । এভাবে ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদির সঠিক ব্যবহার সভ্যতাকে সচল রাখে। মানুষের গুণবাচক প্রবৃত্তি যেমন দয়া-দাক্ষিণ্য, দানশীলতা, ধৈর্য, একাগ্রতা ইত্যাদি গুণাবলি সমাজের জন্য কল্যাণকর, আবার এগুলোর বাড়াবাড়ি ব্যবহার ক্ষতিকর কারণ হয়ে দাঁড়ায় ।

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও abstract গুণগুলোর ভারসাম্য ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজ সচল থাকে ।

সমাজের মধ্যে অবস্থান করে সমাজ সভ্যতাকে সচল রাখতে হয় । খ্রিস্টবাদ এ সত্যকে অস্বীকার করে মানুষকে বৈরাগ্যবাদ ও সংসার ত্যাগের দীক্ষা দিয়েছিল । ফলে মানুষের ফিতরত বা স্বভাব বিরোধী আচরণের প্রতিক্রিয়া (Reaction) সৃষ্টি হয়। ফলে খ্রিস্ট সমাজ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যায়। এ বিষয়টি পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে ।

বৈরাগ্যবাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহতায়ালা কালামে পাকে বলেন :

'আর বৈরাগ্যবাদ যা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তারা নিজেরা প্রবর্তন করেছিল– আমি তাদের উপর এই বিধান প্রদান করি নাই ।

(সূরা : আল হাদীদ, আয়াত ২৭)

<u>তথ্যসূত্র</u>

১. Will Durant : The Story of Civilization, Simon & Schuster, New york 1949.

২. আবদুল হামিদ সিদ্দিকী : পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎস : অনুবাদ : এ. কে. এম নাজির আহমদ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ২য় প্রকাশ ১৯৯০ ।

৩. H.A.L. Fisher- The History of Europe.

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম অধ্যায়

খ্রিস্টধর্ম ও রাজশক্তি

রোম সম্রাট কনসটেনটাইন ভূমধ্যসাগরের নৌপথ নিজ কর্তৃত্বে রাখা এবং এশিয়া অঞ্চলে তার আধিপত্য সুসংহত করার জন্য ইতালির রোম থেকে ৩২৪ সালে প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত নিরাপদ নগরী তুরস্কের ইস্তাম্বুলে রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং নগরীর নাম রাখেন কনসটানটিনেপল। সম্রাটের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে– রোম, ইতালি ও গ্রিস ইত্যাদি এলাকায় নীরবে খ্রিস্টধর্ম ছড়িয়ে পড়েছে। ইউরোপে তার আধিপত্য বহাল রাখার জন্য তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। খ্রিস্টধর্মকে রাজধর্ম ঘোষণা করে তিনি ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা আরম্ভ করেন। তিনি সরকারি ব্যয়ে রোমে বিরাট গির্জা তৈরি করে এ গির্জাকে অন্যান্য সকল গির্জার নিয়ন্ত্রক গির্জায় (Controller) বানিয়ে দেন। এ গির্জার নাম সেন্ট পিটার ক্যাথিড্রেল।

তার মৃত্যুর পর তার তিন পুত্র খ্রিস্টধর্মের স্বার্থ সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তারপর রোম সাম্রাজ্যে ব্যতিক্রমধর্মী এক ঘটনা ঘটে। রোম সম্রাট ৬ষ্ঠ কনসটানটাইনকে গৃহবন্দী করে রাজমাতা আইরিন নিজ হাতে সাম্রাজ্য পরিচালনা আরম্ভ করেন। এ মহিলা অত্যাচারী ও দুশ্চরিত্রা ছিলেন। খ্রিস্টান যাজকেরা তাকে মেনে নিতে পারছিল না। কিন্তু না মেনেও উপায় ছিল না। কারণ সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে দিলে, উদীয়মান মুসলিম শক্তির* কাছে তাদেরকে পরাজিত হতে বাধ্য হতে হবে। ফলে অসন্তুষ্ট চিত্তে তারা আইরিনকে মেনে নিতে বাধ্য হয়।

খ্রিস্টধর্মের নিয়ন্ত্রণকারী রোমের প্রধান গির্জা সেন্ট পিটার ক্যাথিড্রেল এর পোপ হাড্রিয়েন ৭৯৫ সালে মারা যান। তার মৃত্যুর পর পোপ হন তৃতীয় লিও। কিন্তু চারিত্রিক মান ও অন্যান্য কারণে হাড্রিয়েনের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব

* বি. দ্র. এ সময় উমাইয়া খলিফাগণ সিরিয়ার দামেস্কে রাজধানী স্থাপন করে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে নৌশক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

নবনিযুক্ত পোপের আনুগত্য করতে অস্বীকার করেন এবং তাকে হত্যা করা কিংবা তাড়িয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করেন। পোপ তৃতীয় লিও অবস্থা বেগতিক দেখে আলপস পর্বত অতিক্রম করে ফ্রানক রাজা শার্লম্যানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। লিও বিরোধীরা রাজার কাছে পোপের অবৈধ কার্যকলাপের ফিরিস্তি দিয়ে তাকে বরখাস্ত করার আবেদন জানায়।

রাজা শার্লম্যান তার প্রধান পরামর্শদাতা আল কুইনের সাথে পরামর্শ করেন। আল কুইন তাকে বলেন, 'রোম সম্রাট ৬ষ্ঠ কনসটানটাইন গৃহবন্দী। দুশ্চরিত্রা আইরিনকে খ্রিস্ট সমাজ মনেপ্রাণে গ্রহণ করেনি। এদিকে পোপও রোম থেকে বিতাড়িত। রাজা যদি সুযোগ গ্রহণ করে রোম দখল করে পোপ তৃতীয় লিওকে স্ব-স্থানে অধিষ্ঠিত করতে পারেন তাহলে কৃতজ্ঞ পোপ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে রাজাকে রোম সম্রাট ও খ্রিস্ট জগতের প্রধান বানিয়ে দেবে।' পরামর্শ মতো কাজ হলো। রাজা শার্লম্যান রোম দখল করেন এবং পোপকে স্ব-স্থানে অধিষ্ঠিত করেন।

এবার কৃতজ্ঞ পোপ আটশত খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টের জন্ম উৎসব পালন উপলক্ষে মণি-মুক্তা খচিত রাজমুকুট শার্লম্যানের মাথায় পরিয়ে দেন এবং প্রথা অনুযায়ী তার দেহে তৈল মর্দন করেন। এ আনুষ্ঠানিকতার কারণে শার্লম্যান রাজা থেকে রোম সম্রাটে পরিণত হন। রোমের সেন্ট পিটার ক্যাথিড্রেলের উৎসবে উপস্থিত সবাই শার্লম্যানকে রোমের সম্রাট ও খ্রিস্ট জগতের প্রভু হিসেবে আনুগত্য প্রকাশ করল। এভাবে তিনি হয়ে যান রোম সাম্রাজ্যের Lord and Father, Emperor, Priest, Guide and Chief. আর তৃতীয় লিও হন তার একান্ত অনুগত ও বাধ্য পোপ ও খ্রিস্টজগতের আধ্যাত্মিক গুরু।

সম্রাট তার রাজত্বকালে ৫৪টি যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করেন। ৭টি যুদ্ধ ব্যতীত তিনি সকল যুদ্ধে জয় লাভ করেন। ব্যতিক্রম বাদে প্রায় সমগ্র ইউরোপ তার দখলে চলে আসে। যে ৭টি যুদ্ধে তিনি জয় লাভ করতে পারেননি তা ছিল স্পেনের মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে। সম্রাট শার্লম্যান স্পেনের পিরেনিজ পর্বত পার হয়ে 'এব্রা' নদী পর্যন্ত অগ্রসর হন কিন্তু মুসলিম বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে তার বাহিনী আর অগ্রসর হতে পারেনি। উল্লেখ্য যে, স্পেনে মুসলিম শাসন ৭১১ থেকে ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বহাল ছিল।

সম্রাট শার্লম্যানের ধর্ম অর্থাৎ খ্রিস্টধর্ম প্রজারা বিনা বাক্যে গ্রহণ করে নেয়। সম্রাট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলে ইউরোপের সর্বত্র খ্রিস্টধর্ম ছড়িয়ে দেন। তিনি সব জায়গায় গির্জা তৈরি করান, বিশপ নিযুক্ত করেন এবং প্রতিটি গির্জায় প্রচুর জায়গা ও সম্পত্তি প্রদান করেন। আরো একটি আশীর্বাদ তার ভাগ্যে জোটে। ৮১২ সালে কনসটানটিনেপলের বায়জানটাইন সম্রাট তাকে সরকারিভাবে (Officially)

www.nagorikpathagar.org

রোম সম্রাট হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। ফলে সম্রাট শার্লম্যান হয়ে যান খ্রিস্ট জগতের একচ্ছত্র অধিপতি। ৮১৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তিনি মারা যান।

পোপ ও যাজকরা সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে তাদের Policy বদলাতে থাকে। প্রথমে তারা রাজ্যশক্তিকে এড়িয়ে ধর্ম প্রচার করে। পরে রাজশক্তির সহায়তা লাভ করে রাজাকে তোষণ করার নীতি গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় ধর্ম প্রচার করে। অতঃপর রাজা শার্লম্যানকে রোম সম্রাট বানিয়ে তার সহযোগিতায় খ্রিস্টধর্ম পুরো ইউরোপে ছড়িয়ে দেয়। স্থানে স্থানে গির্জা ও মঠ গড়ে তোলা হয়। এগুলো প্রচুর জমি ও সম্পদের মালিক হয়। গির্জা ও মঠে বিদ্যা শিক্ষার চর্চা শুরু হয়। এবার রাষ্ট্র পরিচালনার প্রয়োজনে গির্জা শিক্ষিত রাজ-কর্মচারী সরবরাহ করতে থাকে। এ সকল সরকারি কর্মচারী দ্বৈত আনুগত্য প্রকাশ করে। তারা একদিকে সম্রাট ও রাজার আনুগত্য করে অপরদিকে পোপেরও অনুগত হয়।

শার্লম্যানের মৃত্যুর পর তার পুত্র প্রথম অটো সম্রাট হন। তিনি পিতার মতো যোগ্য ছিলেন না। তিনি পোপ ও যাজকদের সহযোগিতা নিয়ে সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। প্রথম অটোর পর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অটো সম্রাট হন। তৃতীয় 'অটো' নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। তখন পোপ ও যাজক শ্রেণী জনগণকে একমত করে জার্মানির একজন প্রথিতযশা সামন্তবাদী জমিদার ডিউক হেনরিকে রোম সম্রাট হিসেবে সিংহাসনে আরোহণের ব্যবস্থা করেন। ডিউক (জমিদার) থেকে সম্রাট হয়ে কৃতজ্ঞ, হেনরি পদে পদে পোপের পরামর্শে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। সর্বত্র পোপের মনোনীত লোকজন রাজ কর্মচারী নিযুক্ত হন। এভাবে পোপ সম্রাটের চেয়ে বেশি প্রতাপশালী হয়ে ওঠেন।

প্রাসঙ্গিকভাবে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করতে হয়। শার্লম্যানের পরবর্তী সম্রাটগণ তার মতো যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারেননি। পরবর্তী সম্রাটগণ তাদের ভাই কিংবা ছেলেদেরকে কোনো কোনো এলাকার রাজা বানিয়ে দেন। ওরা ঐ ঐলাকাসমূহে স্বাধীন রাজায় পরিণত হয়। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহী বাহিনী জিতে গেলে তাদের নেতা ঐ এলাকার রাজা বনে যান।

এভাবে পরবর্তী ইউরোপ এককেন্দ্রিক নেতৃত্বের পরিবর্তে বহু রাজার দ্বারা শাসিত হতে থাকে। কিন্তু রোমের পোপের প্রতি সবাই আনুগত্য প্রদর্শন করে। ফলে পোপ হয়ে যান ইউরোপের ঐক্যের প্রতীক। এছাড়া সব গির্জায় বিশপ ও যাজক শ্রেণী এবং পোপ মনোনীত রাজ-কর্মচারীগণ পোপের প্রতি রাজার চেয়ে বেশি অনুগত ছিল। ফলে পোপ সব রাজ্যে প্রভাব খাটাতে থাকেন।

এবার পোপ নির্দেশ জারি করে সব গির্জায় সৈন্য বাহিনী পোষণ করার ব্যবস্থা করেন। তার মাথায় নতুন পরিকল্পনা গজিয়ে ওঠে।

www.nagorikpathagar.org

তিনি ভাবেন– যিশু খ্রিস্টের জন্মস্থান বেথেলহাম ও ফিলিস্তিন মুসলমানদের অধীনে। আবার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথ, ভূমধ্যসাগরীয় নৌপথের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলো মুসলমানদের দখলে। এগুলো উদ্ধার করে খ্রিস্ট জগতের হাতে নিয়ে আসতে হবে। পবিত্র স্থানে তীর্থযাত্রা ও বাণিজ্যপথ নিরাপদ করার জন্য পোপ Urban II মুসলমানদের বিরুদ্ধে ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দে ধর্মযুদ্ধ ক্রুসেডের আহ্বান জানান। গির্জার সৈন্যবাহিনী এ অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন। সকল রাজ্য সফর করে তিনি রাজা, সামন্ত নেতা, ডিউক, নাইট, ভাড়াটে সৈন্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে বায়জানটাইন সম্রাট Alexius এর নেতৃত্বে সমর অভিযানে অগ্রসর হন। কিন্তু মুসলিম নেতা ইমাম উদ্দিন জঙ্গের হাতে মার খেয়ে ফিরে আসেন।

ইমাম উদ্দিন জঙ্গের ইন্তেকালের খবর পেয়ে পোপ Eugenius III আবার সকল খ্রিস্টশক্তি একত্রিত করে দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধ ক্রুসেডে অবতীর্ণ হন। ১১৪৮ সালে জার্মানির সম্রাট Conrad III ও ফ্রান্সের রাজা Louis VII সম্মিলিতভাবে এ যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। এবারও ইমাম উদ্দিন জঙ্গের ছেলে নুরুদ্দীন জঙ্গের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে খ্রিস্ট বাহিনীকে ফিরে আসতে হয়।

আবার ক্রুসেডাররা পোপ Gregory VIII এর আহ্বানে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১১৯২ সালে মুসলিম বাহিনীর সাথে সম্মুখ সমরে মুখোমুখি হন। এবার গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর হাতে বিপর্যস্ত হয়ে অপূরণীয় ক্ষতি স্বীকার করে অপমানজনক অবস্থায় সন্ধিপত্রে সই করে তারা ফিরে আসতে বাধ্য হয়।

গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর ইন্তেকালের পর ক্রুসেডাররা আবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করে। এবার মিশরের বীর সুলতান বায়বার্স তাদের উপর চরম আঘাত হানেন। তিনি ১২৯১ সালে হ্রদ টায়ার, সিডন, বৈরুত প্রভৃতি অঞ্চল পুনর্দখল করেন। এবার ক্রুসেডাররা বিতাড়িত হয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে।
(সূত্র : The Arabs : A Short History by Phillip K. Hitti)

বি. দ্র. ক্রুসেডের প্রথম আক্রমণকালে জেরুসালেমের পতন হয়। তাদের হাতে জেরুসালেম শহরের নারী পুরুষ আবাল-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবাই নিহত হয়। শহরের অলিতে-গলিতে স্তূপীকৃত মানুষের হাত, পা, মাথা ইত্যাদি পড়ে থাকতে দেখা যায়। ১১৮৭ সালে গাজী সালাহউদ্দিনের হাতে জেরুসালেম পুনরুদ্ধার হয়।

(সূত্র : The Arabs : A Short History by Phillip K. Hitti)

www.nagorikpathagar.org

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজশক্তির ছত্রছায়ায় যাজক শ্রেণীর কার্যকলাপ

'আমি তোমাদের সকলকে বলি শত্রুকে ভালোবাস। যে তোমাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে তার উপকার কর। যে তোমাকে অভিশাপ দেয়, তার কল্যাণ কামনা কর। যে তোমায় অবমাননা করে তার জন্য প্রার্থনা কর। যে তোমায় এক গালে চড় মারে তার সামনে অপর গালটি বাড়িয়ে দাও। যে তোমার জামা নেয়, তাকে কোট নিতেও নিষেধ করো না। অন্যদের কাছ থেকে তুমি যে ব্যবহার পেতে আশা রাখ, তুমি নিজেও তেমনি ব্যবহার কর। কেবল যে তোমাকে ভালোবাসে তাকেই যদি শুধু ভালোবাস তাহলে তোমার মহত্ত্ব কিভাবে প্রকাশ পাবে? (লুক-৬ : ২৭-৩২)

'যদি তোমরা মানুষের অপরাধ ক্ষমা কর তাহলে তোমাদের আসমানি পিতাও তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর যদি মানুষের ত্রুটি ক্ষমা না কর তাহলে তোমাদের পিতাও তোমাদের ক্ষমা করবেন না।' (লুক ৬ : ১৪-১৫)

এ জাতীয় নৈতিক উপদেশ মেনে অসীম ধৈর্য প্রদর্শন করে যিশুর শিষ্যগণ ধর্ম প্রচার আরম্ভ করেন। তারা আড়াই তিনশত বছর ধর্ম প্রচার করেন। এ সময় তাদেরকে বহু জুলুম-নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে।

প্রথমে রোম সম্রাট ও তার প্রতিনিধিবর্গ এবং ধর্মীয় কায়েমি স্বার্থবাদীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করা হয়। রোম সম্রাট নিরো রোম পোড়ানোর অভিযোগ উত্থাপন করে Available প্রতিটি খ্রিস্টানকে গ্রেফতারের চেষ্টা করে। তাদের কাউকে শূলে চড়িয়ে, কাউকে বাঘ সিংহের খাঁচায় নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়। বহু সংখ্যক নারী-পুরুষ ও শিশুকে রোমের কুখ্যাত আখড়ায় পাশবিক খেলার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৭০ খ্রিস্টাব্দে তিতুসের নেতৃত্বে বায়তুল মাকদিসসহ বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ করে ৯৭ হাজার খ্রিস্টানকে দাস-দাসী বানানো হয়, ১১ হাজার লোককে উপোস রেখে মেরে ফেলা হয়, আরো কয়েক হাজার লোককে সৈন্যদের তরবারি প্রশিক্ষণের শিকারে পরিণত করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

সম্রাট 'নিরোর' পর মার্কোস, আরিলিয়াস, সেপ্টিমোস, সেভিরস, ডেলিসিওস ও ভালেরিয়াস সমান তালে নির্যাতন চালিয়ে যায়। সর্বশেষে ডারোক্লোটিয়াস চূড়ান্ত নির্যাতন অভিযান পরিচালনা করে। সে গির্জা ধ্বংস করে বাইবেল পুড়িয়ে ফেলে। গির্জার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। ৩০৪ খ্রিস্টাব্দে সে নির্দেশ জারি করে যে, যে খ্রিস্টধর্ম পরিত্যাগ করবে না তাকে হত্যা করা হোক। এ নির্দেশের পর বহু খ্রিস্টানকে হত্যা করা হয়। যারা খ্রিস্টধর্ম পরিত্যাগ করতে সাহসিকতার সাথে অস্বীকার করে তাদের দেহ কেটে লবণ ও টক লাগিয়ে নির্যাতন করা হয়। এ সময় প্রার্থনারত ভক্তদের গির্জায় আটকিয়ে গির্জাসহ তাদেরকে পুড়িয়ে মারার ঘটনাও ঘটেছে।

এ হলো মুদ্রার একদিক– মুদ্রার বিপরীত দিকও ঘটনাবহুল তবে সুখকর নয়। রোম সম্রাট কনসটেনটাইন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। এ সময় খ্রিস্টধর্ম রাজধর্মে পরিণত হয়। তখনো সাম্রাজ্যের অর্ধেকের বেশি প্রজা পৌত্তলিক (Pagan) ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। এ সময় পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে নির্যাতন আরম্ভ হলেও মারাত্মক আকার ধারণ করেনি।

Rev. Cutt লিখিত Constantain the Great বইতে নির্যাতনের কিছু নমুনা পাওয়া যায়। বইতে উল্লেখ আছে– 'পৌত্তলিক মন্দিরসমূহের ছাদ ও দরজা খুলে ফেলা হয়। মূর্তিসমূহের বস্ত্র ও অলঙ্কার হরণ করে মন্দির থেকে বের করে দেয়া হয়।'

সম্রাট থিরোডোসিয়াসের সময় দুটি বিধি প্রণীত হয়। বিধিগুলো হলো :

১. রাষ্ট্র নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেটগণ পাপ কাজ দেখলে দোষীদের শাস্তি দেবেন, যদি তারা শাস্তি না দেন তবে তারা এ পাপ কাজের অংশীদার বলে গণ্য হবেন।

২. কল্পিত দেব-দেবী ও প্রতিমা পূজা করা, স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমার বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।

এ সময় রোমান সিনেট আনুষ্ঠানিকভাবে একটি প্রস্তাব পাস করে। প্রস্তাবটির সারমর্ম হলো– 'জুপিটারের পূজা রোমানদের ধর্ম নয়– ধর্ম হলো যিশুর পূজা।' এ সময় সম্রাট একটি ফরমান জারি করেন। ফরমানে বলা হয়– 'যিশু ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর পূজা প্রকাশ্যে বা গোপনে করা যাবে না। যে এ বিধি লঙ্ঘন করবে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড।'

এবার তারা উপরে উল্লেখিত বাইবেলের শ্লোকসমূহ সম্পূর্ণ ভুলে যায়। শুরু হয়

www.nagorikpathagar.org

ধর্মীয় কারণে নির্যাতন। নির্যাতনের নমুনা ঐতিহাসিক Gibbon লিখিত Fall of Roman Empire বইতে পাওয়া যায় : 'এই সময় বল প্রয়োগে পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধন করা হয়। 'গল' নামক প্রদেশে তুরশের বিশপ ধর্মপরায়ণ যাজকদের একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে মন্দির, উপাসনালয়, মূর্তি ও কথিত পবিত্র বৃক্ষসমূহ সমূলে ধ্বংস করেন। সেরাপিসের মূর্তিকে টুকরো টুকরো করে জনসম্মুখে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এসব জুলুম-নির্যাতনের ফল দাঁড়ায় এই যে, পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসীরা বাধ্য হয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে এবং নিষ্ঠাহীন ও অবিশ্বাসী পূজারিতে গির্জা ভর্তি হয়ে যায়।'

Encyclopaedia Baritanica এর Art inquisition অধ্যায়ের কিছু বর্ণনা প্রাসঙ্গিকভাবে নিম্নে উদ্ধৃত হলো : 'সমস্ত অখ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাস ও মতবাদ উৎখাত করার জন্য শক্তি প্রয়োগের বর্বরোচিত পদ্ধতি খ্রিস্টধর্মের অনুসারীরা বৈধ করে নিয়েছিল। রোমের পোপের অধীনে প্রতিষ্ঠিত Inquisition আদালতসমূহ তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। এসব আদালত নাস্তিকতা, খোদাদ্রোহিতা, ইহুদি ধর্ম পালন, ইসলাম গ্রহণ ও বহুবিবাহের ন্যায় অপরাধসমূহের শাস্তি বিধানের জন্য যে সব ফৌজদারি আইন চালু করে তার মধ্যে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা, জিহ্বা কেটে ফেলা, কবর খুঁড়ে হাড়গোড় বের করা অন্যতম। স্পেনের ধর্মীয় আদালতের রায়ে তিন লক্ষ ২৪ হাজার লোককে বিভিন্ন পন্থায় হত্যা করা হয়। এছাড়া মেক্সিকো, কর্ডোভা, সিসিলি, সার্ডিনিয়া, নেপলস ও কালান্ডারাস অঞ্চলের ধর্মীয় আদালতসমূহের রায়ে অখ্রিস্টীয় ধর্ম বিশ্বাস পোষণ করার জন্য অন্তত দেড় লাখ লোককে হত্যা করা হয়।'

এ সময় পোপ ও যাজক শ্রেণীর অধীনে গির্জা ও মঠের কী হাল হয়েছিল তা নিজের ভাষায় বর্ণনা না করে খ্যাতিমান ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবী ও ইতিহাসবিদদের লিখিত যুগান্তকারী ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করা হলো :

'পঞ্চদশ শতাব্দীর বহু পুরোহিত তাদের পূর্বসূরিদের মতো জীবনযাপন করত– এ কথা মেনে নিলেও এটা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই যে, হাজার হাজার পুরোহিত মঠবাসী সন্ন্যাসীর জীবন নৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কলঙ্কে ভরপুর ছিল। এমনকি যাজক শ্রেণীর লোকও উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার প্রয়োজনে ধর্মীয় মত পর্যন্ত বিশ্রীভাবে বিকৃত করা হতো। প্রকৃত অর্থে পোপ ছিলেন যিশুবিরোধী। তার হাতে ধর্মের অধঃপতন ঘটে। পোপের হাতে ধর্ম শোষণের হাতিয়ারে পরিণত হয়। ধর্ম হয়ে পড়ে ইতালীয় ধর্মীয় রাজকুমারদের লাম্পট্য, বিলাসিতা ও স্বার্থপরতা চরিতার্থ করার মাধ্যম।' (Edward Eyre : European Civilization IV P-139)

www.nagorikpathagar.org

'নুরেমবার্গের ডায়েটে (১৫২২ খ্রি.) গির্জার বিরুদ্ধে যে Hundred grievances প্রণয়ন করা হয়, তাতে বলা হয় যে, গির্জা জার্মানির অর্ধেক সম্পদের মালিক হয়ে গেছে। একজন ক্যাথলিক ইতিহাসবিদের মতে গির্জা জার্মানিতে তিন ভাগের এক ভাগ, ফ্রান্সের পাঁচ ভাগের এক ভাগ সম্পদের মালিক ছিল। কিন্তু পার্লামেন্টের প্রকিউরার জেনারেল ১৫০২ সালে হিসাব করে দেখান যে, ফ্রান্সের সব সম্পদের ৪ ভাগের তিন ভাগ গির্জার অধীনে ছিল। ইতালি উপদ্বীপের তিন ভাগের এক ভাগ পোপের রাষ্ট্র হিসেবে গির্জার মালিকানাধীন ছিল। অন্যান্য অংশেও গির্জা মূল্যবান সম্পদের মালিক ছিল।' (Will Durant : The Story of Civilization)

'একজন মঠ অধ্যক্ষ একবার রোমে গেলে পোপ ও কার্ডিনালদেরকে মোটা অঙ্কের দক্ষিণা দিতে হতো। এর বিনিময়ে পরবর্তী নির্বাচনে তার মঠ অধ্যক্ষ পদ লাভ করা সুনিশ্চিত হতো।' (James Hastings : Encyclopedia of Religion and Ethics)

'চতুর্দশ শতাব্দীর একজন ডমিনিকান জন ব্রোমাইড তার সহকর্মী যাজকদের সম্পর্কে বলেন, যাদের দরিদ্রদের পৃষ্ঠপোষক হবার কথা, তারা উত্তম খাদ্যের লোভ করে। তাদের খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিই সকালবেলার প্রার্থনায় অংশ নিতে পারে। তারা ভূরিভোজ ও পানে আসক্ত এবং যাজকদের সমাবেশ এখন লম্পট ব্যক্তি ও অভিনেতাদের বেশ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।'

(Will Durant : The Story of Civilization)

Guy Joucnneaux কে পোপের পক্ষ থেকে ফ্রান্সের বেনেডিকটাইন মঠ ব্যবস্থার সংস্কার করার জন্য পাঠানো হয়। তিনি গির্জার বিষয়াদি সম্পর্কে একটি দুঃখজনক রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি বলেন, 'বহু মঠবাসী সন্ন্যাসী জুয়া খেলে, সরাইখানায় যাতায়াত করে, তলোয়ার সঙ্গে রাখে, টাকা-পয়সা সঞ্চয় করে, যৌন অপরাধ করে, মদ পান করে এবং দুনিয়ার আসক্ত ব্যক্তিদের চেয়ে বেশি পরিমাণ দুনিয়াদার হয়ে গেছে।'

Will Durant : The Story of Civilization)

'গির্জায় ও মঠে কুমারীদের অবস্থা ছিল আরো খারাপ। এ ব্যবস্থার সূচনা ছিল চমৎকার। কিন্তু এক শতাব্দীর মধ্যে উল্টো হাওয়া বইতে শুরু করে। এসব কুমারী নির্জন বাস বেছে নিয়েছিল নোংরামি থেকে মুক্ত হয়ে আত্মার উন্নতি সাধনকল্পে। তাদের জন্য যে নৈতিক মান নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল, তা তারা রক্ষা করতে পারেনি। আত্মার উন্নতির পথ ছেড়ে দিয়ে তারা দেহের চাহিদা

www.nagorikpathagar.org

মেটানোর দিকে ঝুঁকে যায়, কিংবা তাদেরকে ঝুঁকে যেতে বাধ্য করা হয়। তারা লজ্জাশীলতা ও পেশাগত সৎ চরিত্রতা বর্জন করতে থাকে। তারা মাঝে-মধ্যে নিজেদের আবাসস্থল ত্যাগ করে অন্যদের বাসায় যাতায়াত শুরু করে। তারা জনগণের উদ্দেশ্যে নির্মিত গোসলখানায় আসা-যাওয়া শুরু করে। তারা বিভিন্ন জায়গায় জন্মদিন উৎসবে যোগদান করে। তাদের আবাসস্থলে সন্দেহজনক লোকজনের আনাগোনা দেখা যায়। এ সবই ছিল গর্হিত অথচ তাদের কুমারিত্ব ছিল মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত।' (G. G Coulton : Feve Centuries of Religion)

যাজক ও মঠবাসীর অধঃপতনের কারণে তারা জনগণের শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত হয়। তাদের প্রভাব কমতে থাকে। গির্জা ও মঠ প্রকাশ্যে সমালোচনার বস্তুতে পরিণত হয়। এ ব্যাপারে The Cambridge Modern History থেকে একটি উদ্ধৃতি নিম্নে দেয়া হলো :

'ক্রমাগতভাবে বিপুল অর্থ আদায়ের কারণে রোমের পোপকে অধস্তন যাজকগণ ঘৃণা করত। আবার স্থানীয় যাজকদেরকে একই কারণে জনগণ ঘৃণা করত। এ ঘৃণা এতোই তীব্র ছিল যে, ১৫০২ সালে ইরেসমাস লেখেন যে, সাধারণ মানুষের অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, তাদেরকে কেউ মঠবাসী বলে ডাকলে তারা নিজেদেরকে অপমানিতবোধ করত। এ সময় সাধারণ ও নিম্ন শ্রেণীর মানুষরা ভীষণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করত, অথচ পাদ্রী জীবন ছিল প্রাচুর্যে ভরপুর। তাদের ছিল বহুসংখ্যক শিকারি বাজপাখি, কুকুর, জমকালো অনুচরবর্গ ও সুসজ্জিতা মহিলা সঙ্গিনী।'

Drapper তার Science and Religion গ্রন্থে লেখেন :

'তাদের (যাজকদের) টেবিলগুলো ছিল স্বর্ণখচিত। রূপার বাসন-কোসন ছিল মণি-মুক্তা খচিত। তাদের চতুর্দিকে থাকত মূল্যবান পোশাক পরিহিত অনুচরবৃন্দ। যৌন ক্ষুধা উদ্রেকের জন্য পাশে থাকত অর্ধউলঙ্গ বালিকা দল। যে শহরগুলোতে সর্বোচ্চ সংখ্যক যাজক বসবাস করত, সে শহরগুলোতে সর্বোচ্চ সংখ্যক বেশ্যাদের আড্ডা দেখা যেত।'

বাইবেলের বাণী এবং ধর্মযাজকদের প্রচারণার কারণে সাধারণ লোকেরা আসমানি সাম্রাজ্যে প্রবেশের জন্য অর্থাৎ স্বর্গে যাওয়ার জন্য বৈরাগী সেজে মঠে নিষ্ঠার সাথে সাধনার পথ বেছে নিয়েছিল। কিন্তু যখন প্রকাশ হয়ে গেল যে, ধর্মযাজকদের ব্যক্তিগত জীবন আসলে বিলাস, ভোগ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় ভরপুর তখন এক ভয়ানক পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। মানুষ ধর্ম সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে

www.nagorikpathagar.org

গেল। আরো একটি বিষয় ইউরোপের বিদগ্ধ জনগণকে ভাবিয়ে তুলল। বিষয়টি ক্যাথিলিক চার্চ কর্তৃক পাপীদের পাপমোচন করে স্বর্গে যাওয়ার সার্টিফিকেট (Indulgence) বিক্রি। এ বিষয়টি সম্পর্কে একটু পরিষ্কার ধারণা দেয়া দরকার।

প্রচার করা হয় যে, যিশু গির্জাকে পাপ মোচন করার ক্ষমতা দিয়েছেন, ফলে পোপ পাপ মুক্তির সার্টিফিকেট (Indulgence) ইস্যু করা আরম্ভ করেন। গির্জা এ অধিকার লাভ করে 'ইকিউম্যানিক্যাল কাউন্সিল' থেকে। এ কাউন্সিল খ্রিস্টধর্ম পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অধিকারী ছিল। দ্বাদশ ইকিউম্যানিক্যাল কাউন্সিল ঘোষণা করে যে, যেহেতু যিশু গির্জাকে পাপ মোচনের ক্ষমতা দিয়েছেন সেহেতু গির্জা খ্রিস্টানদের মুক্তির জন্য পাপ মুক্তি ও স্বর্গে যাওয়ার সার্টিফিকেট (Indulgence) ইস্যু করবে। কাউন্সিল আরো সিদ্ধান্ত নেয় যে, যদি কোনো খ্রিস্টান এ সার্টিফিকেট নিরর্থক বলে প্রচার করে কিংবা গির্জার এ অধিকার অস্বীকার করে তাহলে তাকে ধর্মচ্যুত করা হবে। সাথে সাথে এও সিদ্ধান্ত হয় যে, এ ক্ষমতা ভেবেচিন্তে প্রয়োগ করতে হবে যাতে যাজকীয় নির্দেশের অপব্যবহার না হয়।

উল্লেখ্য, এ সার্টিফিকেট বহু টাকার বিনিময়ে বিক্রি হতো। ধনী লোক ছাড়া কেউ এ সার্টিফিকেট কিনতে সক্ষম হতো না। প্রচার করা হয় যে, যার নামে সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে, তাকে কোনো পর্যায়ের কেউ স্বর্গে প্রবেশে বাধা দিতে পারবে না। সার্টিফিকেট বিক্রির মাধ্যমে গির্জার প্রচুর আয় হচ্ছিল। তাই তারা বেশি বেশি সার্টিফিকেট বিক্রির জন্য খ্রিস্টজগতের চতুর্দিকে কমিশনের মাধ্যমে দালাল নিযুক্ত করে।

ক্রমে পোপ অধিকতর সম্পদশালী হয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আরো বেশি ভূমিকা রাখতে উদ্যোগী হন।

ঐ সময়কার ইউরোপের চিত্র 'অনাগত মানব সভ্যতা' বইতে সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে :

'গির্জার লোকেরা রাজা ও সম্রাটের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ উত্থাপন শুরু করলো। অভিযোগগুলো কেবল ধর্মীয় ও নৈতিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজনৈতিক প্রাধান্য ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নেও মোকদ্দমা শুরু হলো। একাদশ শতাব্দীতে পোপ এবং সম্রাটের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও বিবাদ শুরু হলো। পুরোদমে চলতে থাকলো এ বিবাদ। প্রথমদিকে পোপ বিজয়ী হলেন। চতুর্থ হেনরি সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিরূপে 'কাসল অব ক্যানোসা'-তে গিয়ে পোপের সাথে সাক্ষাৎ করতে বাধ্য হলেন। এটা ছিল ১০৭৭ সালের ঘটনা। যে পর্যন্ত না

www.nagorikpathagar.org

রাজদরবার বিনীত অনুরোধ জানালো, সে পর্যন্ত পোপ হেনরিকে তাঁর কাছে যেতে অনুমতি দেননি। অতঃপর হেনরিকে নগ্নপদে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হলো। হেনরি মোটা উলের পোশাক পরে প্রবেশ করলেন এবং অনুশোচনা জ্ঞাপন করলেন। পোপ সে অনুশোচনা অনুমোদন করলেন। পোপতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত না হওয়া পর্যন্ত পোপ ও সম্রাটের দ্বন্দ্ব অবিরত চলছিল।

রাষ্ট্রনায়কদের সাথে লড়াই চলাকালে পুরোহিতগণ জনগণের উপর করভার বৃদ্ধি করলো। করভারে অতিষ্ঠ জনগণ গুঞ্জরণ শুরু করলো। তাদের দুর্ভোগ বেড়েই চললো। জনগণের এ অসন্তোষকে পুঁজি করলো রাষ্ট্রনায়করা। তাঁরা জনগণকে গির্জার শোষণের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুললেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা পাদ্রীদের গোপন পাপাচার ও অমিতাচারের কাহিনী জনসম্মুখে ফাঁস করে দিলেন। পাদ্রীসুলভ পোশাকের আড়ালে যে লাম্পট্য আত্মগোপন করেছিল তা জনগণের সামনে নগ্ন হয়ে গেল। এটা ছিল একটা চরম আঘাত। এ পরিণতিতে ভয়ানক নেতিবাচকতা আত্মপ্রকাশ করলো যার ফলে ইউরোপে ধর্ম এবং জীবনের মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের সব সম্ভাবনা বিলীন হলো। ধর্মীয় মতবাদ এবং সমাজ ব্যবস্থা পৃথক হয়ে গেল। নিজ অস্তিত্বের বিরুদ্ধে এটা ছিল পাশ্চাত্য গির্জার সবচেয়ে বড়ো অপরাধ।

এ অপরাধমূলক কাজ কী করে সংঘটিত হলো? প্রথমত : ধর্মযাজকরা বাইবেলের ব্যাখ্যাদানের সব অধিকার নিজেদের হাতে তুলে নিলো। গির্জার বাইরের কোনো চিন্তাবিদ এ গ্রন্থ মূল্যায়ন করার অধিকারী ছিলেন না। দ্বিতীয়ত: খ্রিস্টীয় ধর্মীয় বিশ্বাসে এমন সব কথা সংযোজন করা হলো যেগুলো ছিল দুর্বোধ্য ও অবিশ্বাস্য। যিশু সম্বন্ধে তাদের আজগুবি চিন্তার কথা আর্নল্ড সাহেবের উদ্ধৃতিতে পরিস্ফুট। এসব অস্পষ্ট মতকে তারা 'স্বর্গীয় রহস্য' আখ্যা দিয়েছিল। এগুলোকে উপাসনা পদ্ধতিতে সংযোজিত করল। উদাহরণস্বরূপ 'ইউকারিস্ট অনুষ্ঠানের' কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ অনুষ্ঠানের রুটি ও মদকে যিশুর শরীর ও রক্ত জ্ঞান করা হয়। মার্টিন লুথার, জন ক্যালভিন এবং উলরিখ উইংলি Ulrich Zwingli) এ সবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে প্রোটেস্টানটিজম-এর জন্ম দেন। ইউকারিস্ট অনুষ্ঠানটি খ্রিস্টবাদের একটা নতুন সংযোজন। অবতীর্ণ গ্রন্থে, খ্রিস্টবাদের প্রাথমিক ইতিহাস অথবা ইকিউম্যানিক্যাল কাউন্সিলের কোনো ঘোষণায় তার উল্লেখ নেই।

আসল ব্যাপার ছিল যে খ্রিস্টানরা, 'ইস্টার' উৎসবে চিরাচরিতভাবে রুটি খেত এবং মদ পান করতো। এটাকে তারা প্রভুর সান্ধ্যভোজ নামে অভিহিত করতো। পরবর্তীকালে গির্জা বললো যে, এ রুটি এবং মদ যিশুর প্রকৃত দেহ ও রক্তের রূপ লাভ করে। খ্রিস্টধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্ত যে ব্যক্তি এ রুটি ও মদ গ্রহণ করবে সে ব্যক্তি

www.nagorikpathagar.org

প্রভুর ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। গির্জা এ মত খ্রিস্টানদের ওপর চাপিয়ে দিলো এবং এর বিচার-বিশ্লেষণ নিষিদ্ধ করে দিলো। বলা হলো এ বিষয় কেউ আলোচনা করলে তাকে ধর্মচ্যুত করা হবে।

ধর্মে এসব অবাস্তব ভুল বিশ্বাস ঢুকানো হলো। এগুলোর উৎস অন্বেষণ করার প্রচেষ্টা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো। তারপর গির্জা আরেক কদম এগিয়ে গেলো। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে অনেক আজগুবি থিউরি ধর্ম বিশ্বাসের নামে প্রচার করা শুরু হলো। সমসাময়িককালের কতিপয় ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক এবং প্রাকৃতিক থিওরি ধর্মে ঢুকানো হলো। এগুলোর বেরিশভাগই ছিল ভ্রান্তি ও কল্পনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু এগুলোর আলোচনা, সংশোধন, অস্বীকৃতি এবং বিকল্প তালাশ করা ছিল অবৈধ।

এটাই ছিল খ্রিস্টবাদের উপর শেষ আঘাত। কেননা অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক এ মতগুলো সামান্য পরীক্ষণের মাধ্যমে হতো পরিত্যক্ত।

তদুপরি ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্টে বর্ণিত ভূগোল ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কতিপয় ব্যাখ্যার সাথে ধর্ম যাজকগণ তৎকালীন প্রচলিত সাধারণ জ্ঞান যোগ করলো। এ জ্ঞানকে তারা ধর্মীয় রং দিল এবং একে ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করলো। এ সম্পর্কে ধর্মযাজকদের লেখা বই-পুস্তব বের হলো। তৎকালীন আজগুবি ভূগোল জ্ঞানকে 'খ্রিস্টীয় ভূগোল' আখ্যা দেয়া হলো। এ জ্ঞান যে ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারতো না তাকে 'অধার্মিক' বলা হতো।

এ সময় ইউরোপে যুক্তি প্রবণতার উন্মেষ ঘটেছিল। বিজ্ঞানীরা ধর্মীয় ঐতিহ্য ভেঙ্গে ফেলেছিলো। তারা খ্রিস্টীয় ভূগোলের কড়া সমালোচনা করলো এবং তা প্রত্যাখ্যান করলো। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও ধর্ম বিশ্বাস সাংঘর্ষিক হয়ে পড়লো। বিজ্ঞানীরা ধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করতে থাকলো। এতে গির্জা ক্রুদ্ধ হলো। গির্জার নেতৃবৃন্দ বিজ্ঞানীদেরকে ধর্মত্যাগী বলে ফতোয়া দিতে শুরু করলো। পোপগণ 'ইনকুইজিশন কোর্ট' স্থাপন করলেন। পোপদের কথার এ কোর্টগুলো 'শহর, বন্দর, জঙ্গল, গুহা ও মাঠে ছড়ানো নাস্তিকদের' শাস্তি বিধানের জন্য গঠিত হয়েছিল। এ কোর্টগুলো কালক্ষেপণ না করে খ্রিস্টান জগৎ হতে যে কোনো শত্রুকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে দারুণ উৎসাহ নিয়ে কাজ শুরু করলো। সারা দেশে গুপ্তচর বাহিনী ছড়িয়ে দেয়া হলো। প্রতিটি কাজের খোঁজখবর রাখা শুরু হলো। প্রতিটি নতুন চিন্তাকে সন্দেহের চোখে দেখা হতো। লোকদেরকে তাদের কাজের মতলব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো। একজন খ্রিস্টীয় ধর্মবেত্তা বলেছিলেন, 'স্বাভাবিক পন্থায় কেউ খ্রিস্টান হতে এবং মৃত্যুবরণ করতে সক্ষম

www.nagorikpathagar.org

ছিল না।'

এক হিসাব মতে জানা যায় যে, এসব কোর্টে দণ্ড পেয়েছিল তিন লক্ষ ব্যক্তি। এদের মধ্যে ৩২ হাজার ব্যক্তিকে জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে ফেলা হয়। জীবন্ত দগ্ধ ব্যক্তিদের একজন ছিলেন প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী 'ব্রুনো'। তাঁর 'বহু জগৎ' সম্পর্কিত মতবাদ গির্জার নেতৃবৃন্দের ক্রোধের উদ্রেক করে এবং তাঁকে এক ফোঁটা রক্তপাত ছাড়া মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। তার অর্থ ছিল জীবন্ত পুড়িয়ে মারা। খ্যাতনামা বিজ্ঞানী 'গ্যালিলিও' বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। এ বিশ্বাসের কারণে তাঁকে জীবন দিতো হলো।

এ পর্যায়ে এসে শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং সংস্কারকগণ আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। তাঁরা গির্জার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। গির্জার সাথে যা কিছু সংশ্লিষ্ট ছিল, সবকিছু তারা বর্জন করলো। বর্জন করলো গির্জার ধর্ম-বিশ্বাস ও শিক্ষা, গির্জার শেখানো বিজ্ঞান ও নৈতিক মূল্যমান। খ্রিস্টবাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা দ্বারা এ কাজ শুরু হলো। পরে ধর্মের বিরুদ্ধেই এ বিদ্রোহ পরিচালিত হলো। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের নেতৃবৃন্দের সাথে খ্রিস্টবাদের তথা 'সেন্টপলের' ধর্মের নেতৃবৃন্দের লড়াই শেষ পর্যন্ত সাধারণভাবে বিজ্ঞান ও ধর্মের লড়াইতে পরিণত হলো।

দুর্ভাগ্যক্রমে এসব বিপ্লবীরাও অধ্যয়ন বিশ্লেষণকালে বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করার ধৈর্য অবলম্বন করতে পারেনি। ধর্ম এবং ধর্মীয় কায়েমি স্বার্থবাদের পার্থক্য করার মানসিক সুস্থিরতা এবং চিন্তার স্বচ্ছতা তারাও দেখাতে পারেনি। তারা ধর্ম কর্তৃক নির্দেশিত কর্তব্য ও দায়িত্বসমূহ এবং ধর্যযাজকদের স্বেচ্ছাচার, অনমনীয়তা ও ভুল উপস্থাপনার পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হয়নি। এ পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হলে তারা কোনোদিন ঘৃণাভরে ধর্মকে বর্জন করতে পারতো না। ধর্মযাজকদের প্রতি ঘৃণা এবং অপরিণত চিন্তাশক্তি তাদেরকে ধর্মের প্রতি ন্যায়ানুগ মনোভাব প্রদর্শন করতে বাধাগ্রস্ত করেছে।

সাধারণত এসব কারণগুলোর পরিণতিরূপে প্রচণ্ড নেতিবচাক মানসিকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এ মানসিক ব্যাধি আজ ইউরোপ ও পৃথিবীর অন্যান্য অংশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ইউরোপ গির্জাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। এ উদাহরণ অনুসরণ করে অন্যান্য স্থানে ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হলো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিবেচনা করে দেখা হলো না। ইউরোপ ভেজাল খ্রিস্টবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। এ খ্রিস্টবাদের মূলভিত্তি ও মূল্যমান নানাভাবে দূষিত হয়ে গিয়েছিল। ইউরোপ গির্জার লোকদের শোষণ ও স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। এসব লোক নিজেদের বিরুদ্ধে, ধর্মের

www.nagorikpathagar.org

বিরুদ্ধে এবং পৃথিবীর বিরুদ্ধে অপরাধ করেছিল। গির্জার লোকেরা চরম ঘৃণা ও সার্বজনীন শত্রুতার সম্মুখীন হয়েছিল।

এ পরিস্থিতিটা মূলত ইউরোপীয়। এটা শুধু একটা বিশেষ ধর্মীয় মতের সাথে সম্পর্কিত এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের মূল সত্তার সাথে সম্পর্কিত নয়। তদুপরি এ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিটা ইতিহাসের একটা বিশেষ অধ্যায়ে সীমিত। এ সংঘাতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে অবহিত না হলে এ অলক্ষুণে পরিস্থিতির প্রভাব মুক্ত হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

ইউরোপের আত্মা আজ ঐতিহাসিক কারণে মানসিক ও আবেগগত জড়ত্বে আবদ্ধ। যুক্তি ও ধর্মের লড়াইয়ের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে ইউরোপীয় মন আজ ব্যক্তিত্বের চরম বিপর্যয় সৃষ্টিকারী প্রচণ্ড নেতিবাচকতার শিকার। ইউরোপীয় সাহিত্য, শিল্পকলা, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং জীবনসত্তা আজ ব্যাধিগ্রস্ত। তাই বর্ণিত পরিস্থিতির মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক পরিণতির হাত থেকে নিষ্কৃতির পথ দেখাতে পারে এমন যোগ্যতা আজ ইউরোপের নেই।'

(শহীদ সাইয়েদ কুতুব : অনাগত মানব সভ্যতা ও ইসলাম,

অনুবাদ : অধ্যাপক নাজির আহমদ Publishid by I.I. F. O-1978)

<u>তথ্যসূত্র</u>

1. Edward Gibbon : The Decline & Fall of Roman Empire, The Moderne Library, New york.
2. Edward Eyre : European Civilization, Its Origin & Development, Oxfor 1934.
3. John William Draper : History of Conflict Between Religion & Science, 11th Edition, London 1883.
4. G.G. Coulton; Feve Centuries of Religion, Cambridge 1923.

www.nagorikpathagar.org

সংস্কার ও প্রতিসংস্কার আন্দোলন
(Reform & Counter-reform Movement)

বাইবেলের সুন্দর সুন্দর বাণী ও নীতিকথা শুনিয়ে খ্রিস্টধর্ম নীরবে ইউরোপে প্রবেশ করে। রোম সম্রাট কনসটানটাইনের ধর্ম গ্রহণ ও পৃষ্ঠপোষকতার কারণে খ্রিস্টধর্ম রাজধর্মে পরিণত হয়। ৮০০ সালে রাজা শার্লম্যান রোম সম্রাট হিসেবে অভিষিক্ত হয়ে সমগ্র ইউরোপে খ্রিস্টধর্ম ছড়িয়ে দেন। এ সময় সর্বত্র গির্জা ও মঠ গড়ে ওঠে। গির্জা ও মঠ প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়। সময়ের সাথে সাথে পরিবেশ ও পরিস্থিতি সামনে রেখে খ্রিস্টধর্ম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন হতে থাকে। পোপ রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। সম্পদ ও ক্ষমতা চরিত্র বিনষ্ট করে। পূর্বের একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও সাধনা, ক্ষমতা, ভোগবিলাস, দুর্নীতি ও লাম্পট্যে রূপান্তরিত হয়। নানা কায়দায় বিধি-নিষেধ আরোপ করে চিন্তার স্বাধীনতা সংকুচিত করা হয়। ধর্মীয় আদালতের মাধ্যমে ইচ্ছামতো রায় দিয়ে অমানবিক পদ্ধতিতে মানুষ হত্যা করা হয়।

মঠ ও গির্জায় ইতঃমধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা শুরু হয়। শিক্ষার্থীদের মনে Theory & Practice অর্থাৎ তাদেরকে কি আদর্শ ও নীতিকথা শিক্ষা দেয়া হয়, আর বাস্তবে তারা কি দেখে- এ নিয়ে অনেক প্রশ্ন, অনেক সন্দেহ সৃষ্টি হয়। ভক্ত ও মঠবাসীদের মনেও নানা প্রশ্নের, নানা সন্দেহের সৃষ্টি হয়।

প্রতিটি এলাকায় গির্জা প্রধান কিংবা মঠ অধ্যক্ষ থাকতে হলে রোমের পোপ ও তার নিকটস্থদেরকে বিভিন্নভাবে সন্তুষ্ট করতে হয়। যারা এ কাজে পটু নয়, তারা স্বীয় পদে বহাল থাকতে পারে না। এ সমস্ত বিষয় সামনে রেখে খোদ ধর্মযাজকদের মধ্যে নানা প্রশ্ন, নানা সন্দেহ ঘুরপাক খেতে থাকে। ফলে তাদের মধ্যে ধর্ম সংস্কারের চিন্তা জাগ্রত হয়।

চতুর্দশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের যাজক জন ওয়াইক্লিফ প্রথম সংস্কার আন্দোলন সূত্রপাত করেন। তাকে বলা হয় Morning Star of Reformation. ফ্লোরেন্সের স্যাভানোরোলা, জার্মানির রিউক্লিন, হল্যান্ডের ইরাসমাস ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। জন ওয়াইক্লিফের পথ অনুসরণ করে জন হাস সংস্কার আন্দোলন এগিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। ক্যাথলিক চার্চ তাকে বিরত করার চেষ্টা

www.nagorikpathagar.org

করে। বিরত না হওয়ায় ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ এনে তাকে পুড়িয়ে মারা হয়।

একই পথ ধরে জার্মানির মার্টিন লুথার অগ্রসর হন। রোমের পোপের পক্ষ থেকে পাপ মোচনের সার্টিফিকেট (Indulgence) জার্মানিতে বিক্রি করতে এলে তিনি protest (প্রতিবাদ) করেন। তিনি ছিলেন জার্মানির ইউটেনবার্গ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। ১৫১০ সালে তিনি রোমে যান। রোমের পোপ ও যাজকদের কার্যকলাপ স্বচক্ষে দেখে এসে তিনি ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে ৯৫ দফা প্রতিবাদ লিপি পেশ করেন। কিন্তু পোপ ৯৫ দফা প্রতিবাদ লিপিতে কর্ণপাত না করে উল্টো তাকে চার্চের আওতা থেকে বের করে দেন এবং ধর্মদ্রোহী আখ্যা দেন। মার্টিন লুথার দমবার পাত্র ছিলেন না। তিনি protest (প্রতিবাদ) অব্যাহত রাখেন। তখন থেকে protestant ধর্মের উদ্ভব হয় এবং তার অনুসারীদেরকে বলা হয় protestant.

তখনকার পোপ লিও রোমের সম্রাট পঞ্চম চার্লসকে দিয়ে 'ওয়ার্মস' নামক স্থানে ধর্মসভার আয়োজন করে মার্টিন লুথারকে হাজির করান। লুথার তার মত পরিবর্তন করতে অস্বীকার করায় তাকে আইনের আশ্রয় থেকে বের করে দেয়া হয়। এর অর্থ দাঁড়ায় তাকে যে কেউ যে কোনো স্থানে হত্যা করলে আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ হবে না। **এভাবেই ধর্মীয় সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়।** লুথারের লেখা সব বই পুড়িয়ে ফেলা হয়।

মার্টিন লুথারের সমর্থক স্যাকসনির রাজা তাকে দুর্গে লুকিয়ে রাখেন। লুথারের সংস্কার আন্দোলন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে উত্তর জার্মানি, হলান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশের রাজা ও নাগরিকগণ Protestant ধর্মে দীক্ষিত হন।

ক্যাথলিক ধর্ম, Protestant ধর্মের আন্দোলনের কারণে হুমকির মুখে পড়ে। স্পেনের রাজা ফার্ডিনান্ডের চেষ্টায় আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে Counter Reform আন্দোলন শুরু হয়। ইগ্নেশিয়াস, লয়লা, লাইনেজ, জেভিয়ার প্রভৃতি ক্যাথলিক যাজকগণ আত্মশুদ্ধি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৫৪৫ সালে রোম সম্রাট পঞ্চম চার্লস ট্রেন্ট নামক স্থানে ধর্মসভা আহ্বান করেন। ১৫৬৩ সাল পর্যন্ত এ সভা চলে। সভায় Vulgate নামক বাইবেলের ল্যাটিন অনুবাদ প্রামাণ্য ও একমাত্র অনুসরণীয় ধর্মগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ সভায় মার্টিন লুথারের কঠোর সমালোচনা করা হয় এবং রোমের পোপকে কেবলমাত্র ধর্ম ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সর্বময় কর্তা হিসেবে মর্যাদা প্রদান করা হয়।

অন্যদিকে Inquisition নামে প্রতিটি ক্যাথলিক চার্চে একটি ধর্মীয় আদালত

www.nagorikpathagar.org

স্থাপন করা হয়। প্রথমদিকে এর উদ্দেশ্য ছিল স্পেনের মুসলমান, ইহুদি ও নাস্তিকদের শাস্তি প্রদান করা। ক্রমে এ আদালত protestant সহ ধর্মদ্রোহীদের দমন করার কাজে ব্যবহার হয়। এ আদালতে অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ ছিল না। ফলে Inquisition আদালত ধর্মের নামে অন্যায়, অত্যাচার, বর্বরতা ও অমানুষিকতার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়।

ফলশ্রুতিতে ক্যাথলিক ও প্রটেসট্যান্ট ধর্মে বিশ্বাসী রাজ্যগুলোর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। ১৫৫৫ সালে রোম সম্রাট পঞ্চম চার্লসের নেতৃত্বে ক্যাথলিক রাজ্যসমূহের রাজাগণ প্রটেসট্যান্ট ধর্মে বিশ্বাসী রাজ্যগুলোর রাজাদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। পঞ্চম চার্লস যুদ্ধে সুবিধা করতে না পেরে প্রটেসট্যান্ট ধর্মাবলম্বী রাজাদের সাথে আপোষ-মীমাংসা করতে বাধ্য হন।

৫ম চার্লস সিংহাসন ত্যাগ করে সাম্রাজ্য ভাগ করে তার ছেলে দ্বিতীয় ফিলিপ ও ভাই ফ্যার্ডিন্যান্ডকে দিয়ে অবসর গ্রহণ করেন। ছেলে দ্বিতীয় ফিলিপ স্পেন ও হল্যান্ড লাভ করেন। তিনি স্পেনকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করতে সচেষ্ট হন। চার্লস কট্টর ক্যাথলিকপন্থী ছিলেন। তিনি ঘোষণা করেন প্রটেসট্যান্টসহ ক্যাথলিক ধর্মের বিদ্রোহীদেরকে– 'আগুন পুড়িয়ে, গর্তে ফেলে কিংবা তলোয়ার দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে হত্যা করা হবে।' তিনি Inquisition আদালতের মাধ্যমে অসংখ্য লোককে হত্যা করান। ফলে ক্যাথলিক ও protestant ধর্মে বিশ্বাসী রাজ্যগুলোর মধ্যে ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এ যুদ্ধ ৩০ বছর চলে। বহুলোক নিহত হয়। অবশেষে উভয়পক্ষ একমত হয়ে ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে 'ওয়েস্টফেলিয়ায়' শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে যুদ্ধের অবসান ঘটান।

www.nagorikpathagar.org

অষ্টম অধ্যায়

খ্রিস্টধর্ম পরিণতিতে মানবরচিত মতবাদ 'খ্রিস্টবাদ'

এ ব্যাপারে আলোচনার আগে জানা দরকার ধর্ম কী আর মানবরচিত মতবাদ কাকে বলে?

ধর্ম

সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা মহান আল্লাহতায়ালা মানুষকে সৃষ্টির সেরা আশরাফুল মখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করে তাঁর নিজের খলিফা বা প্রতিনিধি বানিয়েছেন। মানুষের কাজ হলো– তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে ইহজগতে আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়ন করা। তিনি মানুষের জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থান সৃষ্টি করেছেন যে উদ্দেশ্যে তা হলো– আল্লাহ মৃত্যুর পর সকল মানুষের পুনরুত্থান ঘটাবেন, সকলকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করে বিচার করবেন। যে নিজেকে স্বাধীন সত্তা না ভেবে আপন সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি মনে করে তাঁর ইচ্ছা ইহজগতে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করবে আল্লাহ তাকে পুরস্কার হিসেবে বেহেশতে আশ্রয় দেবেন, আর যে বিপরীত কাজ করবে তিরস্কার হিসেবে তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন।

মানুষ কিভাবে তার সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব ইহজগতে পালন করবে– এ ব্যাপারে তাকে অন্ধকারে ছেড়ে দেয়া হয়নি। তিনি মেহেরবানি করে হেদায়াত বা জীবনব্যবস্থা প্রদান করেছেন। আল্লাহপ্রদত্ত জীবনব্যবস্থাকে আরবিতে বলা হয় দ্বীন যার বাংলা অনুবাদ ধর্ম হিসেবে আমাদের সমাজে প্রচলিত হয়ে গেছে। তিনি ফেরেশতা সর্দার জিবরাঈল (আ.) এর মাধ্যমে নবী-রসুলদের কাছে দ্বীন প্রেরণ করেন। নবী অবিকল তা মানুষের সামনে প্রচার করেন। নিজের তরফ থেকে ধর্মে কিছু যোগ বা বিয়োগ করার এখতিয়ার অন্য লোক তো দূরের কথা স্বয়ং রসূলদেরও নেই।

মতবাদ

মানুষের মধ্যে অধিকতর চিন্তাশীল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ (ক) ইচ্ছাশক্তি (খ) বুদ্ধি (গ) প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও (ঘ) অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে মানুষের ইহজীবনের এক বা একাধিক বিভাগ পরিচালনা করার জন্য যে দর্শন ও পথনির্দেশ রচনা

www.nagorikpathagar.org

করেন তা হলো– মতবাদ Ism)।

মহান আল্লাহতায়ালা বনি ইসরাইল কওমের জন্য হযরত ঈসা (আ.) কে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন। তাঁর উপর ফেরেশতা সর্দার হযরত জিবরাঈল (আ.) এর মাধ্যমে আসমানি কিতাব 'ইনজিল' নাজিল করেন। নিঃসন্দেহে হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর নবী। তাঁর উপর আসমানি কিতাব 'ইনজিল' নাজিল হয়েছিল। আনুমানিক ৩৩ খ্রিস্টাব্দে আল্লাহতায়ালা তাঁকে জীবিতাবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নেন। তারপর তার অনুসারীরা প্রধানত রোমকে কেন্দ্র করে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েন। তারা ধর্মে যোগ-বিয়োগ, পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও সংযোজন করে কিভাবে আল্লাহপ্রদত্ত ঈসা (আ.) এর উপর নাজিলকৃত ধর্মকে মানবরচিত মতবাদে পরিণত করে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো :

১. আল্লাহর নবী ঈসা (আ.) এর নাম– 'ঈসা ইবনে মারিয়াম'। আল্লাহ নিজে তাঁর জন্য এ নাম নির্ধারণ করে ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁর মাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। খ্রিস্টবাদীরা তাঁর নাম (proper noun) ঈসা ইবনে মারিয়াম বদলিয়ে রেখেছে Jesus Crist যিশু-খ্রিস্ট। proper noun নাম বদলানো তাদের এখতিয়ারবহির্ভূত।

২. ধর্মের নাম রেখেছে– Christian Religion খ্রিস্টধর্ম। এ নাম আল্লাহ রাখেননি। ঈসা (আ.)ও এ নাম অনুমোদন করেননি। অথচ ধর্ম এসেছে আল্লাহর তরফ থেকে ঈসা (আ.) এর উপর।

৩. ঈসা (আ.) এর নিকট আগত আসমানি কিতাবের নাম 'ইনজিল'। খ্রিস্টবাদীরা 'ইনজিলের' নাম বদলিয়ে রেখেছে 'বাইবেল'। আবার বাইবেল একটি নয় চারটি। যথা : (ক) মথি রচিত বাইবেল (খ) লুক রচিত বাইবেল (গ) যোহন রচিত বাইবেল ও (ঘ) মারকাস রচিত বাইবেল।

এগুলোর একটিও আল্লাহর কালাম নয়, এমনকি ঈসা (আ.) এর নিজের ভাষাও নয়। ঈসা (আ.) ও তার সঙ্গীরা 'সুরিয়ানি' ভাষায় কথা বলতেন। অথচ উপরোক্ত বাইবেলগুলোর ভাষা গ্রিক। এগুলো যদি মূল 'ইনজিল' কিতাবের অনুবাদ হতো, তাহলে একদিকে মূলভাষা অন্যদিকে অনুবাদ থাকাই স্বাভাবিক ছিল। বাস্তবে তা নেই, আছে শুধু গ্রিক ভাষা। মূল কিতাব ও তার ভাষা হারিয়ে গেছে।

(ক) মথি ঈসা (আ.) এর শিষ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি বাইবেল রচনা করেননি। তিনি লিখেছেন Logia যা এখন উধাও হয়ে গেছে। যে বাইবেলটি মথির নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে তার লেখক অজ্ঞাত। এ গ্রন্থ ঈসা (আ.) এর তিরোধানের পর ৭০ সালে রচিত। অনেকের মতে এটি ৯০ খ্রিস্টাব্দের রচনা।

www.nagorikpathagar.org

(খ) লুক কখনও ঈসা (আ.) কে দেখেন নাই। তিনি সেন্টপলের শিষ্য। অথচ সেন্টপলের সাথে ঈসা (আ.) এর সাক্ষাৎ হয়নি। সেন্টপল ঈসা (আ.) এর তিরোধানের ৬০ বছর পর খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। সেন্টপল কার নিকট থেকে ঈসা (আ.)-এর বাণী পেয়েছেন তাও অজ্ঞাত। সেন্টপলের মুখের কথা শুনে শুনে লুক বাইবেল রচনা করেন। লুক রচিত বাইবেলের রচনাকাল নিয়েও মতবিরোধ আছে। কারো মতে ৫৭ সালে, অন্যদের মতে ৭৪ সালে অথচ হ্যারিং, ম্যাক গিফটিং ও পোমারের মতো পণ্ডিতদের মতে ৮০ সালের পর এ বাইবেল রচিত হয়।

(গ) হযরত ঈসা (আ.) শিষ্য যোহন বাইবেল রচনা করেননি। অজ্ঞাত ব্যক্তি বাইবেল রচনা করে যোহনের নামে চালিয়ে দিয়েছে। এটির রচনাকাল ৯০ থেকে ১১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

(ঘ) মারকাসের সাথে ঈসা (আ.) এর সাক্ষাৎ হয়নি। তিনি সেন্ট পিটারের শিষ্য। তার কাছ থেকে শুনে মারকাস বাইবেল রচনা করেন। ৬৩ থেকে ৭০ সালের মধ্যে এটি রচিত হয়।

কুরআন হিফজ করার মতো হাফিজের অস্তিত্ব পূর্বেও ছিল, এখনও আছে। 'ইনজিল' মুখস্থ করার মতো কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। ইনজিল মুখস্থ করার কোনো রেওয়াজও ছিল না। এ চারটি বাইবেলের মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। শুধু তাই নয়– পরস্পরবিরোধী বক্তব্যও আছে। এ বাইবেলগুলোর একটিও তখন জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়নি। প্রথম জনসম্মুখে প্রকাশিত বাইবেল ৩৯৭ খ্রিস্টাব্দে 'কার্টোজেনা' কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদন লাভের পর 'New Testament' নামে প্রকাশিত হয়।

যে প্রাচীনতর বাইবেলগুলো বর্তমানে দুনিয়াতে বিদ্যমান আছে তার প্রথমটির লিপি চতুর্থ শতাব্দীর। দ্বিতীয়টির লিপি পঞ্চম শতাব্দীর। তৃতীয় যে অসম্পূর্ণ লিপিটি বর্তমানে রোমে পোপের লাইব্রেরিতে আছে, তাও চতুর্থ শতাব্দীর আগের নয়। ফলে প্রথম শতাব্দীর বাইবেলের সাথে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর উল্লিখিত বাইবেলগুলোর কতটুকু মিল ও অমিল আছে তা পরিষ্কার নয়। পরবর্তী লিপিকাররা বাইবেলে তাদের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ এবং চতুর্থ ও পশ্চম শতাব্দীর ধ্যান-ধারণা ঢুকিয়ে দেননি– তা হলফ করে বলা যাবে না।

রোম সম্রাট ও পোপ বার বার ধর্মসভা আহ্বান করে বাইবেলের বক্তব্য পরিবর্তন করেছেন– এর বহু উদাহরণ আছে। বই-এর কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় মাত্র একটি উদাহরণ নিম্নে প্রদান করা হলো :

www.nagorikpathagar.org

১৫৪৫ সালে রোম সম্রাট পঞ্চম চার্লস 'টেন্ট' নামক স্থানে ধর্মসভা আহ্বান করেন।

১৫৬৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৮ বছর এ সভা আলোচনা-পর্যালোচনা করে। বিশেষ করে জার্মানির ধর্মসংস্কারক মার্টিন লুথারের খ্রিস্টধর্মের উপর আনীত ৯৫ দফা আপত্তি (Protest) আলোচনার মুখ্য বিষয় ছিল। অতঃপর Vulgate নামে ল্যাটিন ভাষায় একটি বাইবেল প্রকাশ করা হয়। এটিই ক্যাথলিকদের কাছে একমাত্র প্রামাণ্য ও অনুসরণীয় ধর্মগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

৪. ঐতিহাসি H.A.L. Fisher তার বিখ্যাত ইতিহাস The History of Europe গ্রন্থে লেখেন– 'খ্রিস্টান তাত্ত্বিকরা তাদের ধর্মকে ইতিহাসের পাল্টা গতিতে পরিচালিত করেনি। বরং ইতিহাসের ঐশী লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে চেয়েছেন। তারা ইহুদি ধর্মগ্রন্থ, গ্রিকদর্শন ও সিবিলের দৈববাণীতে তাদের ধর্মের উৎস খুঁজেছেন।'

H.A.L. Fisher আরো বলেন–

'রোমান চার্চ একটি বিষয়ে সর্বদা বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে– যা কিছু প্রতিরোধ করা যাবে না, তা মেনে নেয়াই ছিল তাদের রীতি। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী লোকদের বহু দেবতাবাদ তারা গ্রহণ করে এবং তাদের ধর্মের অধীন করে নেয়। প্যাগানদের অশরীরী আত্মাকে তারা রূপান্তরিত করে খ্রিস্টান Angel এ। প্যাগান আইসিস হয়ে যায় খ্রিস্টান Madona. প্যাগান উৎসব হয়ে যায় খ্রিস্টান ধর্মীয় উৎসব। আধ্যাত্মিক সহায়ক শক্তি মধ্যস্থতাকারীদের প্রতি মানুষের আস্থা লক্ষ্য করে রোমান চার্চ এদের স্বীকৃতি প্রদান করে। বস্তুগত অনেক জিনিসকে শক্তিমান গণ্য করার প্রবণতাকে বরণ করে নেয়। মূর্তি ও চিত্র স্বীকৃতি লাভ করে। পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন উপাসনা এবং স্মৃতিচিহ্নের মন্দির দর্শন স্বীকৃতি পায়। সপ্তম শতাব্দীতে মানসিকতা ও নৈতিকতার অধঃপতন সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আর সে সময় খ্রিস্টধর্মের বস্তুগত কিংবা কুসংস্কারাচ্ছন্ন দিকটা বিকাশের সুযোগ পায়। রোমের চার্চে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল। আরো বেশি প্রচলন ছিল বাইজান্টিয়ান চার্চে।'

৫. খ্রিস্টবাদীরা এমন কিছু বিশ্বাস ও কিছু কর্মকাণ্ড ধর্মে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে যা অযৌক্তিক, অনৈতিক ও বাস্তবতা বিরোধী। এগুলো আল্লাহর মনোনীত হবার প্রশ্নই ওঠে না। আল্লাহর নবী ঈসা (আ.)ও এগুলো সমর্থন করতে পারেন না। যেমন :

(ক) ত্রিত্ববাদে (Trinity) বিশ্বাস

খ্রিস্টবাদীরা তিন খোদায় বিশ্বাসী। তারা আল্লাহ, হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত

www.nagorikpathagar.org

জিবরাঈল (আ.) কে খোদা বানিয়েছে। ঈসা (আ.) কে তো তারা আল্লাহর জৈবিক সন্তান বানিয়ে ছেড়েছে। তাদের ভাষায় তাদের তিন ঈশ্বরের নাম God Father, God Son and Holy Ghost. অথচ 'আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি। কার কাছে থেকে জন্ম নেননি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়।' ঈসা (আ.) তাঁর বান্দা ও রাসূল। জিবরাঈল (আ.) ফেরেশতাদের সর্দার, আল্লাহর সৃষ্টি ও বিশ্বস্ত কর্মচারী।

(খ) আদি পাপ মতবাদে বিশ্বাস

খ্রিস্টবাদীদের বক্তব্য– আদম ও হাওয়া (Adam & Eve) নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে স্বর্গচ্যুত হয়েছেন। এটি আদি পাপ। God Son যিশুখ্রিস্ট স্বর্গ থেকে এসে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে দেহত্যাগ করে সেই আদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। যে এ মতবাদে বিশ্বাস করবে, সে সমাজে যত অপরাধ করেছে, তার যত নৈতিক স্খলন আছে, সবটাতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হলেও মাফ পেয়ে সে আসমানি সাম্রাজ্যে অর্থাৎ স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে।

অর্থাৎ পাপ করলেন একজন, আর প্রায়শ্চিত্ত করলেন অন্যজন, আর এ কথা বিশ্বাস করলেই সব পাপ মাফ।

প্রকৃত ঘটনা হলো– হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে যে অপরাধ করেছিলেন, তওবা করার কারণে আল্লাহ তাদের উভয়কে মাফ করে দেন এবং আদম (আ.) নিষ্পাপ অবস্থায় নবী হয়ে দুনিয়াতে আসেন। আর প্রত্যেক মানবশিশু জন্মায় নিষ্পাপ অবস্থায়।

(গ) পাপমোচন সার্টিফিকেট (Indulgence) বিক্রি :

বাইবেলে আছে :

'আমি তোমাদের বলছি, ধনীদের আসমানি সাম্রাজ্যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। আমি আবার বলছি, সুচের ছিদ্র দিয়ে উট চলে যাওয়া, ধনীদের স্বর্গে যাওয়া অপেক্ষা সহজতর।' (মথি : ১৯-২১)

উপরোক্ত বাইবেলের শ্লোকের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, খ্রিস্টানরা ধনী হতে পারবে না। কারণ ধনী হয়ে গেলে স্বর্গে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে। আবার দেখা যায়, খ্রিস্টধর্ম সংশোধন করার অধিকার রাখে তাদের একটি সংস্থা 'ইকিউম্যানিকেল কাউন্সিল।'

দ্বাদশ 'ইকিউম্যানিকেল কাউন্সিল' ঘোষণা করে যে, যেহেতু যিশু গির্জাকে

www.nagorikpathagar.org

পাপমোচনের ক্ষমতা দিয়েছেন, সেহেতু পোপ পাপমোচন ও স্বর্গে যাবার সার্টিফিকেট (Indulgence) বিক্রি করতে পারবেন। এ সিদ্ধান্তের পর বহু টাকার বিনিময়ে ধনীদের কাছে (Indulgence) সার্টিফিকেট বিক্রি করা শুরু হয়। ধনীরা বিশ্বাস করত তাদের স্বর্গে যাবার পথ God Father কোনো অবস্থাতেই রুদ্ধ করতে পারবেন না যেহেতু তাদের সঙ্গে Indulgence সার্টিফিকেট আছে। কার্যত 'ইকিউম্যানিকেল কাউন্সিল' God Father থেকেও শক্তিশালী হয়ে যায়, কারণ এ সংস্থা God Father এর নির্দেশনাবলি সংশোধন করার ক্ষমতা রাখে। এ যেন খোদার উপর খোদকারী।

(ঘ) ইউকারিস্ট অনুষ্ঠান

খ্রিস্টবাদীদের ইউকারিস্ট অনুষ্ঠানে মদ ও রুটি রাখা হয়। এ মদ ও রুটিকে যিশুর রক্ত ও মাংস মনে করা হয়। তারা প্রচার করে এ মদ ও রুটি যিশুর প্রকৃত দেহ ও রক্তের রূপ লাভ করবে। যে ব্যক্তি এ অনুষ্ঠানে মদ ও রুটি খাবে সে প্রভুর ক্ষমা প্রাপ্ত হবে। ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা Funeral (দাফন) অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদেরকে মদ ও রুটি পরিবেশন করে। অথচ সবাই জানে সকল ধর্মে মদ নিষিদ্ধ।

৬. মহিলারা Door of Devil

খ্রিস্টবাদীরা মহিলাদেরকে Door of Devil অর্থাৎ শয়তানের প্রবেশদ্বার মনে করে। তাদের বক্তব্য হলো– সর্গোদ্যানে আদম নিষিদ্ধ গাছের ফল খেতে প্রথম রাজি হননি। Eve (হাওয়া) তাকে খেতে বধ্য করেন। আর Eve কে Devil (শয়তান) ফুসলিয়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেতে রাজি করায়। এ কারণে 'আদি পাপ' সংঘটিত হয়। তাই তারা মহিলা সমাজকে 'Door of Devil' অর্থাৎ 'শয়তানের প্রবেশদ্বার' আখ্যায়িত করে।

খ্রিস্টজগতের এক বড়মাপের পাদ্রী Tartulian বলেন, 'নারী হচ্ছে মানুষের মনের মধ্যে শয়তান প্রবেশ করার ফটক। সে-ই তো পুরুষকে নিষিদ্ধ গাছের নিকট ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বরের আইন লঙ্ঘনকারী তো সে। ঈশ্বরের প্রতিকৃতি অর্থাৎ পুরুষকে সেই তো বিকৃত করেছে।'

এ অভিযোগ মহিলা সমাজের চরম অবমাননা।

৭. খ্রিস্টবাদীদের মধ্যে Deist নামে একটি সম্প্রদায় আছে, যারা মনে করে ঈশ্বর ছয়দিনে সৃষ্টি কাজ সমাপ্ত করে সপ্তম দিনে বিশ্রামে চলে গেছেন।

www.nagorikpathagar.org

তার আর কোনো কাজ নেই। মানবজাতির জীবন পরিচালনায় তাঁর কোনো ভূমিকা কিংবা নির্দেশনা নেই।

৮. আল্লাহতায়ালা হযরত ঈসা (আ.) কে বনি-ইসরাঈল কওমের জন্য নবী বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং ঈসা (আ.) এর নবুওয়তের দাওয়াত বনি ইসরাঈল বাদে অন্য কোনো মানবগোষ্ঠীর জন্য প্রযোজ্য নয়। সেন্টপলই প্রথম ইহুদি সমাজের বাইরে অ-ইহুদি মানবসমাজে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন। তিনি পরিবেশ ও পরিস্থিতি সামনে রেখে ধর্মে ছাটাই-বাছাই করে বক্তব্য রাখতেন। তাই অনেকে খ্রিস্টবাদকে সেন্ট জন পলের মতবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করে।

এ অধ্যায়ে শিরোনামের সমর্থনে বহু উদাহরণ প্রদর্শন করা সম্ভব। আকলমন্দের জন্য ইশারাই যথেষ্ট। আল্লাহপ্রদত্ত ও ঈসা (আ.) এর উপর নাজিলকৃত ধর্ম Original রূপে নাই। আসমানি মূল কিতাব 'ইনজিলের' অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। খ্রিস্টান যাজকশ্রেণী মূল ধর্ম পরিবর্তন করে ফেলেছে। এখন আছে বাইরে ধর্মের মোড়ক– আর ভেতরে মানবরচিত মতবাদ তথা খ্রিস্টবাদ।

www.nagorikpathagar.org

নবম অধ্যায়

সেকুলারিজমের উদ্ভব, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে ইউরোপে মধ্যযুগের অবসান এবং রেনেসাঁ ও আধুনিক যুগের সূচনা হয়। ১৪৫৩ সালে তুরস্কের উসমানি সাম্রাজ্যের খলিফা সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহর হাতে রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী কনসটানটিনেপল (ইসতাম্বুল) এর পতন হয়। ৩২৪ সালে রোম সম্রাট কনসটেনটাইন তুরস্কের ইস্তাম্বুল দখল করে রোম থেকে রাজধানী স্থানান্তর করে এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি ইস্তাম্বুলের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখেন 'কনসটানটিনেপল'। বায়জান্টিয়ান সম্রাটগণ এখান থেকে ভূমধ্যসাগরের উভয়পাড়ে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় দাপটের সাথে শাসনকাজ পরিচালনা করতেন। তাদের রাজত্বকালে ইউরোপের বিভিন্ন এলাকার শিক্ষার্থীরা কনসটানটিনেপল, বাগদাদ, দামেস্ক, বৈরুত, কায়রো, গ্রানাডা, কর্ডোভা ইত্যাদি মুসলিম অধ্যুষিত স্থানের বিদ্যাপীঠগুলোতে লেখাপড়া করতে। কনসটানটিনেপলের পতনের পর তারা ইউরোপে ফিরে যায়। আসার সময় তারা বই-পুস্তক, গবেষণালব্ধ তথ্য ও তত্ত্ব এবং অতীতের পাণ্ডুলিপি সাথে নিয়ে আসে। তাছাড়া এ সময় আরবি থেকে বহু মূল্যবান বই-পুস্তক ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়। ফিরে এসে তারা ইউরোপের প্রধান নগরগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলে।

এবার তারা পুরোদমে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে জীবনমান উন্নত করার পথে অগ্রসর হয়। অন্যদিকে মুসলমানদের আবিষ্কৃত সমুদ্রযাত্রার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সাগর, মহাসগর পাড়ি দিয়ে তারা আমেরিকা, কানাডা, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশসমূহে যেতে সক্ষম হয়। ফলে সমুদ্রপথে ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার হয়। আফ্রিকা থেকে দাস নিয়ে ব্যবসা, খনিজসম্পদের অনুসন্ধান ও প্রাপ্তি, কলোনি স্থাপন এবং শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে তারা আর্থিক দিক দিয়ে প্রভূত উন্নতি সাধন করে।

এ সময় তাদের বুদ্ধিজীবীরা গির্জা ও পোপের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করতে মনোনিবেশ করে। তাদের স্মরণ হয় পোপ ও যাজকরা তাদেরকে ক্রুসেডে

www.nagorikpathagar.org

(ধর্মযুদ্ধে) শরিক হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং বলেছিল– স্বয়ং God Son যিশু নিজে এ অভিযানে নেতৃত্ব দেবেন। অথচ বার বার তাদেরকে ক্রুসেডে পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে আসতে হয়। দীর্ঘ এগারশত ত্রিশ বছরের রাজধানী কনসটানটিনেপল বাধ্য হয়ে ছেড়ে আসতে হয়।

যাজকদের নিয়ন্ত্রণ আরোপের কারণে অতীতে তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে এবং নতুন কিছু আবিষ্কার করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাদের বহুলোককে আগুনে পুড়িয়ে এবং অন্যান্য পন্থায় হত্যা করা হয়। ঐ সময় খ্রিস্টধর্ম ও বিজ্ঞান এবং যাজক শ্রেণী ও চিন্তাবিদদের মধ্যে যে সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তার একটা সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর লেখা Islam and The World বইতে :

'প্রথমদিকে খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে অতঃপর ক্রমান্বয়ে সাধারণভাবে ধর্মের বিরুদ্ধেই বৈরিতা সৃষ্টি হয়ে যায়। যে যুদ্ধ প্রথমদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির পতাকাবাহী ও খ্রিস্টধর্মের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিল, পরে তা বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সংঘাতের রূপ ধারণ করে। একপক্ষ হয়ে যায় জ্ঞান-বিজ্ঞান আর ধর্ম হয়ে যায় প্রতিপক্ষ। উভয়ের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়। ফলে প্রগতিবাদী ও মুক্তবুদ্ধির পতাকাবাহীরা নিজ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান এক সাথে অবস্থান করতে পারে না। এ জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি বিশ্বস্ততা প্রমাণের নিমিত্ত প্রয়োজন হয় ধর্মের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। এদের সামনে যখন ধর্মের নাম উচ্চারিত হতো, তখন আকস্মিকভাবে ধর্মীয় প্রতিনিধি ও গির্জার পুরোহিতদের লোমহর্ষক জুলুম-নিপীড়নের ভয়াবহ ছবি তাদের চোখে জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠত। উঠত সেসব নিরপরাধ জ্ঞানী-গুণী, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের ছবি, যারা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে ও অসহায় অবস্থায় ঐসব জল্লাদদের হাতে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুবরণ করেছিল। ধর্মীয় সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর নামে ক্রোধব্যঞ্জক চেহারা, রুদ্র ও রুক্ষমূর্তি, অগ্নিঝরা চোখ ও সংকীর্ণ হৃদয় পাদ্রীদের স্থুলমস্তিষ্ক তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠত। ফলে কেবল খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধেই নয় সকল ধর্মের প্রতি ভীতি ও ঘৃণাকে তারা জীবনের মূলনীতি বানিয়ে নেয়।'

গির্জা, পুরোহিত ও ধর্মের প্রতি বুদ্ধিজীবীদের আস্থা বিনষ্ট হয়। তাদের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে– যাজকরা God Father, God Son, Holy Ghost, আসমানি গ্রন্থ, আসমানি সাম্রাজ্যের কথা বলে তাদেরকে পরজগতের সুখ স্বপ্ন দেখায় অথচ তারা নিজেরা ইহজগতের যতো ধরনের মজা আছে সব ভোগ করে। এবার তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তারা God Father, God Son, Holy

www.nagorikpathagar.org

Ghost, আসমানি গ্রন্থ, আসমানি সাম্রাজ্য তথা পরজগৎ অন্যকথায় ধর্মকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে ইহজগৎকেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনা আরম্ভ করে। 'এ জগতে কিভাবে মানুষের উন্নতি ও সম্পদের সমৃদ্ধি হয় এবং কিভাবে এ জগতেই সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ করা যায়'– এটাই হয় তাদের গবেষণার মুখ্য বিষয়। এ জাতীয় চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার ফসল হলো সেকুলারিজম (Secularism)।

সেকুলারিজমের সংজ্ঞা এ বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবার সেকুলারিজমের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হচ্ছে :

The New Encyclopedia Britanica-এর ২০০৩ সালের সংস্করণের দশম Volume এ ৪৯৪ পৃষ্ঠায় সেকুলারিজম সম্পর্কে বলা হয় :

'Any movement in a society directed away from other worldliness to life on earth. In the European middle ages, there was a strong tendency to religious persons to despise human affairs and to meditate on God and afterlife. As a reaction to this medieval tendency, Secularism, at the time of Rennaissance, exhibited itself in the development of humanism, when people began to show more interest in human cultural achievements and the possibilities of their fulfilment in this world. The movement towards Secularisms has been in progress during the entire course of modern history and has been viewed as being anti-cristian & anti Religion.'

'পরকাল বাদ দিয়ে ইহজগৎকেন্দ্রিক চিন্ত-ভাবনাকে মূলধন করে পরিচালিত হয় সেকুলারিজমের আন্দোলন। ইতঃপূর্বে মধ্যযুগে মানবিক বিষয়গুলো বাদ দিয়ে ঈশ্বর ও পরজগৎকেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণা ও গবেষণা প্রাধান্য পেত। মধ্যযুগের এ জাতীয় চিন্তা-ভাবনার প্রতিক্রিয়া (Reaction) হিসেবে রেনেসাঁ যুগে মানবিকতার উন্নতি সাধন, মানুষের সাংস্কৃতিক অর্জন ও এ জগতেই তার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখার ব্যাপারে মানুষ অধিকতর মনোযোগী হয়। এর ফলশ্রুতিতে সেকুলারিজমের উদ্ভব হয়। সেকুলারিজমের আন্দোলন আধুনিক যুগে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। সেকুলারিজমের এ আন্দোলন খ্রিস্টধর্ম ও ধর্মবিরোধী আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।'

Encyclopaedia of Religion & Ethics এ উল্লেখ করা হয় :

Secularism may be described as a movement intentionally ethical, negatively religous with political and philosophical Antecedenta.

www.nagorikpathagar.org

অর্থা– সেকুলারিজম রাজনীতি ও অবরোহী দর্শনের ভিত্তিতে ধর্মের বিপরীত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এক নৈতিক আন্দোলনের নাম।

সেকুলারিজমের আন্দোলনকে বেগবান করতে আধুনিক যুগের যে সকল বুদ্ধিজীবী কলম ধরেন তাদের কয়েকজনের বক্তব্য নিম্নে প্রদান করা হলো :

ইংল্যান্ডের National Secular Society এর সভাপতি Mr. Charles Bradlaugh তার Autobiography বইয়ে লেখেন :

'সেকুলারিজম ও আস্তিকতা পাশাপাশি চলতে পারে না। তাই আস্তিকতাবাদী বিশ্বাসের সাথে লড়াই করা সেকুলারিজমের জন্য অপরিহার্য। অদৃশ্য বিশ্বাস ও মানবপ্রগতি পাশাপাশি চলতে পারে না।

ধর্মীয় বিশ্বাস প্রতিহত করাই সেকুলারিজমের কর্তব্য। কেননা এসব কুসংস্কারমূলক ধারণা, বিশ্বাস যতদিন পর্যন্ত পূর্ণ শক্তিতে বিরাজমান থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত বস্তুগত উন্নতি লাভ কল্পনাতীত হয়ে থাকবে।

ধর্ম অজানা জগৎ নিয়ে কথা বলে। ফলে ইহকালীন বিষয়ে ধর্মের কোনো স্থান নেই, যেমন পরজগতের ব্যাপারে সেকুলারিজমের কোনো বক্তব্য নেই।'

* Jeferson বলেন :

  'সেকুলারিজম গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে একটি দেয়াল নির্মাণ করতে চায়।'

* John Stuart Mill বলেন :

  'ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে মানুষকে অন্য কারো কাছে দায়ী হতে হবে– আমি এ ধারণাকে দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করি।'

* খ্রিস্ট সমাজের মধ্যে Deist নামক একটি গ্রুপের মতামত হলো :

  'সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন– যিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন, কিন্তু মানবজাতির পার্থিব জীবন পরিচালনায় তার কোনো ভূমিকা বা নির্দেশনা নেই।'

সেকুলার চিন্তাধারায় বিশ্বাসী কিছু ব্যক্তিবর্গ মনে করেন– কেউ যদি ধর্ম বিশ্বাস করতে চায় এবং সৃষ্টিকর্তা, পরকাল, পুনরুত্থান, শেষ বিচার, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদিতে বিশ্বাসী হয়, তাকে তার বিশ্বাস থেকে বিরত রাখার কোনো দরকার নেই, কারণ মরার পর সে মাটিতে মিশে যাবে, তার পুনরুত্থান হবে না ফলে তার বিচারের সম্মুখীন হবার প্রশ্নই উঠবে না। কিন্তু ধর্ম বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তি তার আকিদাগত দর্শনের ভিত্তিতে ইহজগতে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক, শিক্ষাব্যবস্থা কিংবা বিচারব্যবস্থা সংক্রান্ত অর্থাৎ মানুষের

www.nagorikpathagar.org

ইহজাগতিক কোনো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

একটি বইতে সেকুলারিজমের ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে :

> Secularism is independent of Religion.
>
> Secularism is not dependent on Religion.
>
> Secularism is not subordinate to Religion.
>
> Secularism is not controlled by Religion.
>
> A Secular person does not belong to any Religion.

অর্থাৎ সেকুলারিজম ধর্ম থেকে পৃথক। ধর্মের উপর নির্ভরশীল নয়। ধর্মের অধীন নয়। ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়।

একজন সেকুলার ব্যক্তি কোনো ধর্মের উপর বিশ্বাসী নন।

সেকুলারিজম এমন এক রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শন :

১. যা মানবরচিত একটি মতবাদ।

২. যার আওতা (scope) ইহজগৎ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এ মতবাদ ইহজগতের বাইরে আর কোনো জগতের (পরকালের) অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়।

৩. এ মতবাদে বিশ্বাসীগণ মানুষ ছাড়া বাইরের কোনো শক্তির নিকট থেকে জ্ঞান আহরণের প্রয়োজন মনে করে না। অন্য কথায় ওহিলব্ধ জ্ঞান অস্বীকার করে।

৪. এর আওতাধীন বিষয়গুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইহজগতেই সম্ভব। ইহজগতের জন্য যা ভাল ও উপকারী কেবল তারই অনুসন্ধান করতে হবে।

৫. মানবীয় সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ হতে হবে বস্তুগত উপায়ে এ জগতে।

৬. অদৃশ্য বিশ্বাস ও মানব প্রগতি এক সাথে চলতে পারে না।

৭. ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস কুসংস্কারমূলক এবং বস্তুগত উন্নতির প্রতিবন্ধক।

৮. মানুষ কেবল মানুষ ছাড়া অন্য কোনো শক্তির নিকট দায়ী নয়।

৯. সামষ্টিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কোনোভাবেই ধর্মকে বিবেচনায় আনা যাবে না।

www.nagorikpathagar.org

অতএব স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সেকুলারিজম ধর্মের অতি প্রয়োজনীয় উপাদন :

আল্লাহ

আখিরাত

পুনরুত্থান

শেষ বিচার

বেহেশত

দোযখ

ফেরেশতা

ওহি

নবুওয়ত

আসমানি কিতাব

এর উপর এক কথায় ধর্মের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না।

সেকুলারিজমের পক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক আন্দোলন

সেকুলারিজমের নামকরণ ও সত্তার দিক দিয়ে প্রধান ব্যক্তি হলেন George Jacob Holyoake. ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে তার জন্ম এবং ১৯০৫ সালে তার মৃত্যু হয়। তিনি ১৫ বছর বয়সে Chartism নামক সংস্কার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৮৪১ সালে তিনি দৃঢ়তার সাথে সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করেন। এ কারণে ব্লাসফেমি আইনে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং 'ক্যালটেনহামে' কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। গ্রেফতারের পর খ্রিস্টধর্মের প্রতি তার ঘৃণা অধিকতর গভীর তীব্র ও প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি 'Reasoner' নামক পত্রিকায় লেখেন– 'আমরা সকলে খ্রিস্টধর্মের ভ্রান্তিমূলক রীতিনীতি প্রত্যাখ্যান করছি।' ১৮৪৯ সালে তিনি Secular Society গঠন করে সেকুলারিজমের পক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৮৬৬ সালে এ সোসাইটিতে যোগদান করেন Charles Bradlaugh. এ সময় এ সোসাইটির নামকরণ করা হয় National Secular Society. Mr. Charles Bradlaugh এ সোসাইটির

www.nagorikpathagar.org

সভাপতি নির্বাচিত হন। আর George Jacob Holyoake হন সোসাইটির সেক্রেটারি। Mr. Charles Bardlaugh ১৮৮০ সালে বিলাতের Northampton আসন থেকে M.P নির্বাচিত হন। কিন্তু তিনি ধর্মীয় কায়দায় শপথ নিতে অস্বীকার করায় তার আসন খালি হয়ে যায়। দুই বছর পর শপথ নেবার এ পদ্ধতি পরিবর্তন হয়। তারপর তিনি একই আসন থেকে ৪ বার M.P. নির্বাচিত হন। উক্ত National Secular Society জনমত সৃষ্টিতে বিরাট ভূমিকা পালন করে এবং রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ প্রভাবিত করে। তাছাড়া এ সংগঠন পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহে আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়।

ফ্রান্সে সেকুলারিজম

ফ্রান্সে Secularism এর পরিবর্তে যে পরিভাষাটি ব্যবহার হয় তার নাম Laicism. এর অর্থ হলো 'অধর্মীয় ব্যবস্থা'। রাষ্ট্র, সমাজ, আইন ব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইত্যাদি থেকে গির্জার কর্তৃত্ব মুক্ত করার জন্য Laicism আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯০৪-০৫ সালে এ আন্দোলন সফলতা অর্জন করে। ১৯০৪ সালে রাষ্ট্রীয় আইন করে পোপের বিচারিক ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে রহিত করা হয়। এ সাল থেকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে গির্জায় অনুদান প্রদান করা নিষিদ্ধ হয়। পরবর্তী সময়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও স্থানগুলো থেকে সকল প্রকার ধর্মীয় প্রচারণামূলক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

সেকুলারিজম সম্পূর্ণ একটি পাশ্চাত্য মতবাদ

জাপান থেকে আরম্ভ করে ভারত, মধ্যএশিয়া, মক্কা, মদিনা, ফিলিস্তিন ও কায়রো পর্যন্ত বহু সভ্যতার উত্থান-পতন হয়েছে। এ এলাকাসমূহে বহু নবীর আগমন হয়েছে। ইতিহাসে কোথাও ধর্মের সাথে বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক কিংবা রাজনীতিবিদদের সাথে এমন সংঘাত যা পাশ্চাত্যে ঘটেছে, প্রাচ্যে তার নজির নেই।

Secularism এর বাংলা অনুবাদ

সেকুলারিজমের তিনটি বাংলা অনুবাদ হতে পারে। যথা :

১। ইহজাগতিকতাবাদ ২। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ৩। ধর্মহীন মতবাদ।

www.nagorikpathagar.org

১. ইহজাগতিকতাবাদ

এটাই সেকুলারিজমের সঠিক অনুবাদ। Secularism ল্যাটিন শব্দ Saeculum শব্দ থেকে উদ্ভব হয়েছে। Saeculum শব্দের অর্থ ইহজগৎ। এ মতবাদের সমস্ত চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপ ইহজগৎকেন্দ্রিক। সুতরাং Secularism এর সঠিক অনুবাদ হবে ইহজাগতিকতাবদ।

২. ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ

এটি Secularism এর সঠিক বাংলা অনুবাদ নয়। তবে সমাজে এ অনুবাদ প্রচলিত হয়ে গেছে। ধর্ম ইহজগৎ ও পরজগৎ উভয় জগৎকে স্বীকার করে। কিন্তু সেকুলারিজম কেবলমাত্র ইহজগৎ স্বীকার করে আর পরজগতকে করে অস্বীকার। তবে Secularism is fully independent of religious ideas and religion অর্থাৎ ধর্মীয় ধ্যানধারণা ও ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক (Independent) মতবাদের নাম হলো Secularism. এ অর্থে এর অনুবাদ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ চলতে পারে।

যে ব্যক্তি চিন্তা-চেতনায়, ধ্যান-ধারণায় ও কার্যকলাপে ধর্মের পক্ষে অবস্থান করল, সে হলো ধর্মের পক্ষের লোক। আর যে ব্যক্তি ধর্মীয় বিশ্বাসের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান সৃষ্টিকর্তা, ওহি, আসমানি কিতাব, রিসালাত, আখিরাত, পুনরুত্থান, শেষবিচার, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদির উপর বিশ্বাস স্থাপন থেকে পৃথক (Independent) থাকল, সে হলো ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি।

ধর্মনিরপেক্ষ শব্দের মধ্যে 'নির' প্রত্যয় যোগ করা হয়েছে। 'নির' এর অর্থ 'নেই' অর্থাৎ ধর্মের পক্ষে নেই। অথবা ধর্মের 'অপেক্ষা' নেই যার। বাংলা একাডেমির অভিধানে 'অপেক্ষার' এক অর্থ করা হয়েছে ভরসা/নির্ভরতা অর্থাৎ যে ব্যক্তির ধর্মের উপর ভরসা বা নির্ভরতা নেই, সেই হলো ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি।

৩. ধর্মহীন মতবাদ

যেহেতু ধর্মের প্রতি এ মতবাদের আস্থা নেই– তাই এ মতবাদ হলো ধর্মহীন মতবাদ।

৪. সেকুলারিজমের আরবি অনুবাদ (একমাত্র পরিভাষা) 'আল লাদিনিয়াহ' অর্থাৎ ধর্মহীন মতবাদ।

৫. ফ্রেঞ্চ ভাষা ব্যবহারকারী অঞ্চলে Secularism কে Laicism বলা হয় যার অর্থ– 'অধর্মীয় ব্যবস্থা'।

www.nagorikpathagar.org

সেকুলার বাগানের কয়েকটি চারা

সেকুলারিজমের চিন্তা-চেতনার উপর ভিত্তি করে ইউরোপে বহু দর্শন ও মতবাদ গড়ে উঠেছে। এ দর্শন ও মতবাদগুলো পশ্চিমাবিশ্বে ইতিহাস বিনির্মাণ ও জীবন পরিচালনায় বিরাট ভূমিকা রেখেছে। পুস্তকটিতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। মাত্র কয়েকটি মতবাদ বইটির বক্তব্যের সাথে প্রাসঙ্গিক মনে করে সংক্ষিপ্ত আকারে তার পরিচয় প্রদান করা হচ্ছে :

১. বস্তুবাদ

এটি একটি দর্শন। 'যার ওজন আছে এবং স্থান দখল করে তাকে বস্তু বলা হয়। বস্তু থেকে বস্তুবাদ দর্শন। এ দর্শনের মূল কথা :

এ বিশ্বজগৎ ও তার নিয়ম-শৃঙ্খলা এক আকস্মিক দুর্ঘটনার ফসল। এ জীবন ও জগৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং নিজস্ব শক্তির সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। চলতে চলতে এক পর্যায়ে একদিন আপনা আপনি ধ্বংস হয়ে যাবে।

এককোষী প্রাণী থেকে বিবর্তনের (Evolution) মাধ্যমে মানুষ বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। মানুষ অন্যান্য পশু থেকে উন্নতমানের এক পশু। মানুষের মধ্যে ইচ্ছা, বাসনা, লালসা ইত্যাদি রয়েছে। তার নিজের মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শক্তি রয়েছে যার সাহায্যে ইচ্ছা, বাসনা, লালসা চরিতার্থ করা যায়। সমস্ত জগতে বস্তু সামগ্রী ও উপায়-উপকরণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, যার উপর মানুষ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োজন পূরণ করবে।

মানুষ সামষ্টিক জীবনযাপনের প্রয়োজনে নিজেরা আইন-কানুন রচনা করবে এবং পৃথিবীর সকল জীবজন্তু ও বস্তুর সাথে সম্পর্ক ও কর্মনীতি নির্ধারণ করবে। এ ব্যাপারে সে প্রাকৃতিক জগৎ ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সম্ভারের সহযোগিতা নিতে পারে। বস্তুর বাইরে দৃশ্যমান পর্দার আড়ালে অতীন্দ্রিয় কোনো সত্তার অস্তিত্ব নেই। সুতরাং বাইরে থেকে জ্ঞান লাভের প্রশ্ন অবান্তর।

মানুষের ইহকালীন জীবনই একমাত্র ও চূড়ান্ত জীবন। সকল কাজের প্রতিফল এ

www.nagorikpathagar.org

জগতে সীমাবদ্ধ ও সমাপ্তব্য। সুতরাং কেবল এ দুনিয়ায় প্রকাশিত ফলাফলের ভিত্তিতে কোনো নিয়ম-নীতি ও আইন-কানুনের শুদ্ধ-অশুদ্ধ, উপকারী-ক্ষতিকর, গ্রহণযোগ্য বা বর্জনযোগ্য নির্ধারণ করতে হবে।

সংক্ষেপে এটি বস্তুবাদ– একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সকল মৌলিক প্রশ্নের জবাব ও সকল সমস্যার সমাধান এ দর্শনে রয়েছে।

এ দর্শনে সৃষ্টিকর্তা বা সৃষ্টি নিয়ন্তার কোনো স্থান নেই। মানুষের বাইরে অন্য কোনো শক্তির কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের কোনো সুযোগ নেই। মানুষ কেবল মানুষ ছাড়া অন্য কোনো শক্তির কাছে জবাবদিহি করবে না। মানুষ মরে মাটির সাথে মিশে যাবে। সুতরাং এ মতবাদে পুনরুত্থান, শেষ বিচার ও পুরস্কার, তিরস্কারের প্রশ্ন ওঠে না। মানুষ স্বাধীন, দায়িত্বহীন ও স্বাধিকার সমন্বিত এক সত্তা। তার ইচ্ছা, বাসনা, লালসা পূর্ণ করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এর বাইরে আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণে যে সকল বস্তু ও মানুষ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, সে সব জিনিসপত্র ও মানব সমষ্টি তার কাছে মূল্যবান ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

বি. দ্র. মায়ের পেটে যখন শিশুর প্রাথমিক অবস্থা অর্থাৎ শুক্রাণু ও ডিম্বাণু একত্রিত হয়ে ক্রমান্বয়ে রক্তপিণ্ড ও মাংসপিণ্ড সৃষ্টি হয়, তখন আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে রুহের (প্রাণবায়ুর) আবির্ভাব হয়– শিশুর প্রাণ সঞ্চালনের লক্ষণ ফুটতে আরম্ভ করে। তারপর শিশু ভূমিষ্ঠ হয় এবং পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হয়ে জীবনধারণ করে একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অর্থাৎ তার 'রুহ' চলে যায় আর লাশ মাটিতে পড়ে থাকে। 'রুহ' বস্তু নয়। অথচ রুহ তার অভ্যন্তরে থাকা অবস্থায় সে কতো কল্পনা করে, কতো চিন্তাভাবনা করে, কত দর্শন, কত মতবাদ রচনা করে। আর এ রুহ শরীর থেকে বের হয়ে যাবার পর শুধু বস্তু অর্থাৎ লাশই পড়ে থাকে যা জ্বালিয়ে অথবা মাটির অভ্যন্তরে লুকিয়ে ফেলে তার একান্ত আপনজন পরিবেশ নির্মল রাখে। সুতরাং মানুষ শুধু বস্তুই নয়– বস্তুর অভ্যন্তরে 'রুহ' নামক একটি অবস্তুরও সমষ্টি। এ রুহকে অস্বীকার করে ইহজাগতিকতাবাদীরা বস্তুবাদী দর্শন আবিষ্কার করেছে। তারা গোটা জগৎ মন্থন করেছে অথচ নিজের অভ্যন্তরের রুহের সাথে পরিচিত হতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

২. ডারউইনবাদ/ক্রমবিকাশবাদ/বিবর্তনবাদ (Theory of Evolution)

আল্লাহ্, রসুল ও আখিরাত বাদ দিয়ে ইহজগৎকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার ফসল আরো একটি মতবাদ ডারউইনবাদ। এ মতবাদ ক্রমবিকাশবাদ, বিবর্তনবাদ, Theory of Evolution নামেও পরিচিত। ইংল্যান্ডের চার্লস রবার্ট ডারউইন এ মতবাদের আবিষ্কারক। ডারউইনের জন্ম ১৮০৯ সালে, আর মৃত্যু ১৮৮৮ সালে। তার পিতা ছেলেকে ডাক্তার বানাতে চেয়েছিলেন। পরে পিতা বুঝতে পারলেন ছেলের ডাক্তার হওয়ার যোগ্যতা নেই। তাই তিনি ডারউইনকে কেমব্রিজ ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি করান। উদ্দেশ্য তাকে ধর্মযাজক বানাবেন। ডারউইন Crist College এ তিন বছর লেখাপড়া করেন। ডারউইন লেখেন– 'এ সময় আমি নিয়মমাফিক প্রার্থনা করে, বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে নেশা করে এবং তাস খেলে কাটিয়েছি।'

এ তিন বছর পর তার আর লেখাপড়া করা কিংবা ধর্মযাজক হওয়া সম্ভব হয়নি। তিনি 'বিগল' নামক একটি জাহাজে চাকরিতে যোগদান করে পাঁচ বছর অতিবাহিত করেন এবং জাহাজে করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ান। পাঁচ বছর পর দেশে এসে 'সমুদ্রযাত্রার ইতিবৃত্ত' রচনা করেন। অতঃপর তার লেখা সুবিখ্যাত দুটো বই 'Origin of Species' এবং 'The Descent of Man' প্রকাশিত হয়। এ দুটো বইতে তিনি যে মতবাদ প্রকাশ করেন তা হলো 'Theory of Evolution' অর্থাৎ বিবর্তনবাদ। এ মতবাদের মূল কথা :

আদিকালে পৃথিবী যখন বসবাসের উপযুক্ত হয়, তখন আকস্মিক এক সংঘাতের ফলে এককোষ বিশিষ্ট এক প্রাণীর (unicellular Amoeba) সৃষ্টি হয়। পরে তাতে বিপুল জীবন-সংগতি ও বেঁচে থাকার যোগ্যতার উদ্ভব হয়। কালের ঘাত-প্রতিঘাতের সাথে শক্তি পরীক্ষা এবং বহু, বহু, বহু বছরের ক্রমাগত প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) ও ক্রমবিকাশের (Evolution) এর মাধ্যমে বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে ঐ এক কোষবিশিষ্ট প্রাণী বিবর্তনের ক্রমধারায় বানর প্রজাতি এবং সর্বশেষে মানুষ প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

ডারউইন লেখেন– 'আমাদের বিদ্বেষ ও অহংকারই আমাদের পিতৃপুরুষের মুখে এ কথা বলিয়েছে যে, তারা দেবতার সন্তান। আর এ অনুভূতিই মানুষকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে দেয়নি যে, তারা স্বতন্ত্র কোনো সৃষ্টি নয়– আসলে তারা অন্যান্য জীবজন্তুর ক্রমবিকাশপ্রাপ্ত বংশধরমাত্র।'

www.nagorikpathagar.org

'সমগ্র উচ্চরতর গুণপনা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মানুষ এখন পর্যন্ত নিজের দেহের মধ্যে সেকালের অমোছনীয় চিহ্নসমূহ বহন করে চলছে, যখন সে নিম্নমানের জীবের আকৃতিতে ছিল।'

ডারউইনবাদ বিশ্লেষণ করলে যে চিত্র ফুটে ওঠে তা হলো : এ বিশ্বজগৎ একটি সংগ্রাম ক্ষেত্র। জীবন স্থিতির জন্য এখানে প্রতি মুহূর্তে এক চিরস্থায়ী যুদ্ধ চলছে। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম, দ্বন্দ্ব, প্রতিরোধ বিশ্ব প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম। বাঁচার যোগ্যতা যে দেখাতে পারে, কেবল তারই বাঁচার অধিকার আছে। যে ধ্বংস হয়, দুর্বল বলেই সে ধ্বংস হয়। যে বেঁচে থাকে, সে সংগ্রাম করেই টিকে থাকে। শক্তিমান বলেই সে বেঁচে থাকে। আর বেঁচে থাকাই তার অধিকার। মাটি, জমি, পারিপার্শ্বিক যাবতীয় বস্তু, জীবনযাপনের যাবতীয় উপায় উপাদান সবকিছু ভোগদখল করার অধিকার একমাত্র শক্তিমানের। কারণ বেঁচে থাকার যোগ্যতার প্রমাণ সে দিয়েছে। দুর্বলের কোনো অধিকার স্বীকৃত নয়। অতএব শক্তিমানের জন্য স্থান ছেড়ে দেয়াই তার কর্তব্য। শক্তিমান যদি শক্তি প্রয়াগ করে দুর্বলকে স্থানচ্যুত কিংবা বিলুপ্ত করে তবে এটা তার অধিকার এবং তার পক্ষে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।

ভূপৃষ্ঠে প্রায় পাঁচ লক্ষ প্রকার প্রজাতি (species) আছে। ডারউইনের মতে আকস্মিক এক সংঘাতের ফলে এককোষ বিশিষ্ট প্রাণী দেহে (Amoeba) প্রাণের সঞ্চার হয়। তারপর বংশবৃদ্ধি, ঘাত-প্রতিঘাত, শক্তি পরীক্ষা, বাঁচার লড়াই, যোগ্যতমের উর্ধ্বতন (Survival of the fittest) ক্রমাগত প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) ও ক্রমবিকাশের (Evolution) ধারা অতিক্রম করে এককোষ বিশিষ্ট (Unicellular) প্রাণী থেকেই প্রায় পাঁচ লক্ষ প্রকারের প্রজাতির (species) রূপান্তর ঘটেছে। মানুষ তন্মধ্যে এক প্রকার প্রজাতিমাত্র।

এ মতবাদ উনবিংশ শতাব্দীতে চমক সৃষ্টি করলেও আজকাল বৈজ্ঞানিকরা এ মতবাদের সত্যতা স্বীকার করেন না। এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক স্যার আর্থার কিইথের একটি চমৎকার মন্তব্য আছে। মন্তব্যটি হলো :

'Evolution is unproved and unprovable. We believe it because, the only alternative is special creation and that is unthinkable.'

অর্থাৎ : 'জীব সৃষ্টির ব্যাপারে বিবর্তন মতবাদ প্রমাণিত নয় এবং প্রমাণ করাও সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও এ মতবাদ মেনে নেয়া হয় এ জন্য যে, এটা না মানলে স্বীকার করে নিতে হবে যে সৃষ্টিকর্তা সকল জীব সৃষ্টি করেছেন– যা আমাদর জন্য অচিন্তনীয়।'

www.nagorikpathagar.org

ইউরোপের সেকুলারপন্থীরা এ মতবাদ জীবতাত্ত্বিক (Biological) দিক দিয়ে গ্রহণযোগ্য কিনা তা প্রমাণ করার জন্য মোটেই আগ্রহ প্রদর্শন করেনি। অথচ এর দার্শনিক দিক তারা হুমড়ি খেয়ে লুফে নিয়েছে।

এ মতবাদ তারা প্রচার করে বুঝাতে চেয়েছে- মানুষ অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের মতো এক জীবমাত্র। সবার মূল এক জায়গায়। এককোষ বিশিষ্ট প্রাণী থেকে সবার উদ্ভব। আকস্মিক এক সংঘাতের ফলে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। 'সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছেন'- এ তত্ত্ব ঠিক নয় কারণ সৃষ্টিকর্তা বলতে কিছুই নেই। প্রাকৃতিক জগৎ স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলছে। ক্রম বিবর্তনের ফলশ্রুতিতে মানব নামক প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে। কালের চক্রে সে অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হবে। মানুষ পশু সবই যন্ত্রমাত্র। স্বাভাবিক নিয়মে যন্ত্র চলছে। এদের মধ্যে 'স্বাধীন ইচ্ছার' কোনো অস্তিত্ব নেই। স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে কিংবা প্রাণশক্তি ফুরিয়ে গেলে তার মৃত্যু ও লয় হবে। মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রশ্ন ওঠে না।

এ জীবন দর্শনে সহানুভূতি, দয়া-দাক্ষিণ্য, প্রেম-ভালোবাসা, আত্মত্যাগ, ইনসাফ, ন্যায়বিচার, দায়িত্বশীলতা, অন্যের অধিকার রক্ষা করা, সততা, সত্যবাদিতা ইত্যাদি abstract গুণাবলির কোনো স্থান নেই। এখানে দুর্বলের কোনো অধিকার স্বীকৃত নয়। আর শক্তিমানের শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্বলের অধিকার কেড়ে নেয়া বা তাকে ধ্বংস করে ফেলে কোনো অপরাধ নয়। এ জন্য তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে না। এটা শক্তিমানের জন্মগত অধিকার। কেননা এ বিশ্বজগৎ একটি যুদ্ধক্ষেত্র। এ যুদ্ধক্ষেত্রে তারই টিকে থাকার অধিকার আছে, যে যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারবে। দুর্বলের টিকে থাকার কিংবা বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। ফলে জুলুম-নিষ্পেষণ বলতে আর কিছুই থাকে না। জুলুম করা শক্তিমানের অধিকারে পরিণত হয়।

এ মতবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইউরোপিয়ানরা বিশ্বযুদ্ধ বাধায়, বিভিন্ন দেশ দখল করে, কলোনি স্থাপন করে, কলোনির সম্পদ লুট করে নিজ দেশ সমৃদ্ধ করে, উভয় আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার আদিবাসীদের বংশ ধ্বংস করে, দুর্বলদের ধরে নিয়ে দাসে পরিণত করে আর ডারউইনপন্থীরা ফতোয়া জাহির করে- এটা তাদের জন্মগত অধিকার কারণ তারা যোগ্য। যারা নিশ্চিহ্ন হয়েছে, টিকে থাকার যোগ্যতা নেই বলে তারা নিশ্চিহ্ন হয়েছে বা দাসে পরিণত হয়েছে। তাদের প্রতি অন্যায়, অবিচার কিংবা জুলুম করা হয়নি।

সম্ভবত ডারউইনের এ দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতিসংঘের Veto Power অধিকারী মুষ্টিমেয় দেশগুলো নিজেদের হাতে Veto Power রেখেছে। তারা মনে করে Veto Power সংরক্ষণ করা তাদের যোগ্যতা ও জন্মগত অধিকার। আর যাদের

www.nagorikpathagar.org

এ ক্ষমতা নেই সে দেশ ও জাতিগুলোকে তাদের ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করাও তাদের জন্মগত কর্তব্য।

৩. মেকিয়াভেলি মতবাদ

এ মতবাদের প্রবক্তা নিকোলো মেকিয়াভেলি ১৪৬৯ সালে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫২৭ সালে তিনি মারা যান।

লেখাপড়া শেষ করে তিনি সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। ১৪৯৮ সালে তিনি সচিব পদে উন্নীত হন। কূটনীতিক হিসেবে তিনি দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। ১৫১২ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে তিনি নির্বাসিত হন। অতঃপর তাকে জেলে যেতে হয়। জেলে বসে তিনি কয়েকটি বই লেখেন। এর মধ্যে দুটো বই The Prince এবং The Discourse সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। The Prince বইটি তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছর পর প্রকাশিত হয়।

বই দুটোতে তিনি যে মতামত জাহির করেন তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ :

সাধারণ জনগণ বোকা ও কোনো যুক্তির ধার ধারে না। তারা মরীচিকার পেছনে দৌড়াতে অভ্যস্ত। মানুষ ভীষণ লোভী, স্বার্থপর ও নীচ মনোভাব সম্পন্ন। সে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে খুব সচেতন। আর্থিক লাভ-ক্ষতির বিষয়টিকে মানুষ সব সময় অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। আর্থিক ক্ষতি বরদাস্ত করতে সে রাজি নয়। সে তার পিতার হত্যাকারীকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত, কিন্তু নিজের সম্পদ অপহরণকারীকে মাফ করতে নারাজ। সে নিজের স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক কার্যকলাপ বাছবিচার করে।

মানুষের কাজ করার পেছনে দুটো মানসিকতা কাজ করে। একটি ভয়, অন্যটি ভালোবাসা। মানুষ থেকে কাজ আদায় করতে হলে প্রয়োজন ভীতি প্রদর্শন। ভয় না পেলে সে কাজ করবে না। মানুষ প্রাচুর্য ও বিলাসিতার আকাঙ্ক্ষী। সে নিজের জন্য স্বাধীনতা চায় কিন্তু অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে দ্বিধা করে না। সরকার কঠোর হলে সে শর্তহীন আনুগত্য প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। মানুষ স্বভাবত রক্ষণশীল। নতুনের প্রতি আগ্রহ এবং অজানাকে জানার ব্যাপারে সে খুব উৎসাহী নয়। পুরনো ও পরিচিত পথ ধরে চলতে সে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। তাই বিদ্রোহ করার মনোভাব তার মধ্যে খুব কমই সৃষ্টি হয়। মানবসন্তান ভীরু ও অভ্যাসের দাস। সাধারণ জনগণ অকৃতজ্ঞ, বাচাল, কপট, বিপদ এড়ানোর জন্য ব্যাগ্র ও অর্থলোলুপ।

মেকিয়াভেলি সাধারণ জনগণের চরিত্রের এ চিত্র অঙ্কন করেন। তারপর তিনি

www.nagorikpathagar.org

শাসনকর্তাকে ক্ষমতা অর্জন, ক্ষমতার প্রভাব বিস্তার ও শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্য যে পরামর্শ প্রদান করেন তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ :

End justfies the means.

পরিণতি ভালো হলে অসৎ পন্থা অবলম্বন কোনো অন্যায় নয়। শাসনকর্তা ক্ষমতা অর্জন ও সংরক্ষণের জন্য যে কোনো পন্থা অবলম্বন করবেন। তিনি পদ্ধতির যৌক্তিকতা ও ন্যায়-অন্যায় নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। লক্ষ্য অর্জিত হলে কেউ পদ্ধতির দোষ-গুণ নিয়ে প্রশ্ন উঠায় না– কিছুদিন পর সব ভুলে যায়।

শাসনকর্তাকে শৃগালের মতো ধূর্ত ও সিংহের মতো হিংস্র হতে হবে। জনগণকে সন্ত্রস্ত করে রাখতে হবে। তিনি আইনের কঠোর প্রয়োগ করবেন। আইন প্রয়োগে কাজ না হলে পাশবিকতার পথ অনুসরণ করবেন। এ ক্ষেত্রে দ্বিধা বা সংকোচ ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে।

দুষ্টের দমনের জন্য নিষ্ঠুরতা ও ছলনার আশ্রয় নিতে হবে। শাসকের জন্য ন্যায়-অন্যায় বলতে কিছুই নেই। শঠতার আশ্রয় নিতে তাকে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে। এ পন্থা অবলম্বন করে তিনি সমাজ থেকে বিশৃঙ্খলা দূর করবেন।

স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশ্বাস ভঙ্গ করা যাবে। অতীতের বহু নামজাদা শাসক বিশ্বাস ভঙ্গ করে ঘৃণিত হননি।

শাসনকার্য পরিচালনায় ধর্ম, নৈতিকতা ও আদর্শের কোনো স্থান নেই। তাকে ধর্ম ও নৈতিকতা সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলতে হবে।

ধর্ম, নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শের ব্যাপারে তাকে দ্বৈত ভূমিকা (Double Standard) পালন করতে হবে। প্রজাদের জন্য যে বিধি-বিধান ও নীতি-নৈতিকতা অবশ্য পালনীয়, শাসনকর্তার জন্য তা পালন করা জরুরি নয়। তিনি প্রয়োজন মাফিক নীতি অনুসরণ করবেন, পরিস্থিতির প্রয়োজনে তা পাল্টিয়ে ফেলবেন। তাকে কপট হতে হবে। প্রয়োজনে ভান করবেন। পরিস্থিতির সবকিছু সবাইকে খুলে বলা যাবে না। পরিস্থিতির স্বার্থে কোনো ওয়াদা করলে তা পূরণ করা অত্যাবশ্যক নয়। পরিস্থিতি বাধ্য করলে তাকে দয়া, মানবতা, ধর্মের বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে। তাকে অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে ভাগ্য ও পরিবেশ ও পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে চলতে। আর তাকে স্মরণ রাখতে হবে পৃথিবী অতি সাধারণ স্তরের মানুষ নিয়ে চলছে। মানুষকে প্রবঞ্চিত করা সহজ তবে এ ব্যাপারে আনাড়ির মতো নয়, কৌশলী হতে হবে। যে কোনো পন্থায় ক্ষমতা ধরে রাখতে হবে। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ভণ্ডামি বা

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বাসঘাতকতা কোনো অপরাধ নয়।

অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাকে তার নিজের বড়ত্বের এমন এক উদাহরণ স্থাপন করতে হবে এবং এ ঘটনার চর্চা জনগণের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে চালু রাখতে হবে।

তাকে ভালো ও আধুনিক অস্ত্র মজুদ করতে হবে। দেশের নিরাপত্তা সঙ্কটের সম্মুখীন হলে সম্ভাব্য সকল পন্থা অবলম্বন করে দেশ রক্ষা করতে হবে। এছাড়া যুদ্ধে লিপ্ত থাকা সাফল্য অর্জনের চাবিকাঠি। সাবধানী হওয়ার চাইতে দুর্ধান্ত হওয়া উত্তম। শান্তির সময়ও যুদ্ধাবস্থার ভাব বহাল রাখা শাসকের জন্য কল্যাণকর।

বি. দ্র. ১. এ দুটো বইয়ের প্রচুর সমালোচনা হয়েছে। তারপরও The Prince বইটি পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রনায়কের বালিশের নিচে সযতনে রাখতে দেখা যায়।

বি. দ্র. ২. খৃ. পূ. ৪র্থ শতকে ভারতীয় কূট পণ্ডিত কৌটিল্য এ জাতীয় একটি বই রচনা করেন। বইটির নাম 'অর্থশাস্ত্র'। ভারতের বহু রাজনৈতিক ব্যক্তি এ বইয়ের ফর্মুলা অনুসরণ করেন।

৪. ফ্যাসিবাদ

ধর্মের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে সাধারণ মানুষের উপর শাসক শ্রেণীর একচেটিয়া কর্তৃত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে গড়ে উঠা আরো একটি মতবাদ হলো– ফ্যাসিবাদ।

এ মতবাদেরও জন্ম হয় ইতালিতে। ইতালির বেনিটো মুসোলিনি হলেন এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ইতালিতে ১৯২০ সালে 'ফ্যাসিস্ট দল' নামে একটি দল গঠন করেন। ১৯২২ সালে এ দল রোমের সর্বময় ক্ষমতা দখল করে এবং রাষ্ট্রের উপর এ মতবাদ চাপিয়ে দেয়।

মুসোলিনির নামে 'ফ্যাসিবাদ' শিরোনামে একটি বই প্রকাশিত হয়। বইটি তার বক্তৃতা ও উদ্ধৃতির সমষ্টি। এ বইতে ফ্যাসিবাদের আদর্শ প্রচার করা হয়।

ফ্যাসিবাদের মূল কথা হলো :

রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান, রাষ্ট্র ঐক্য ও কল্যাণের প্রতীক। ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র নয়– রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি। রাষ্ট্রের গৌরব, মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যক্তিকে যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য অর্জিত হলে স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তির কল্যাণ হবে।

www.nagorikpathagar.org

ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র একটি সর্বাত্মক রাষ্ট্র (Totalitarian state)। এ ধরনের রাষ্ট্রে ব্যক্তি ও সমাজ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। এ ব্যাপারে মুসোলিনির বক্তব্য–

Everything for the state, nothing against the state, nothing outside the state.

অর্থাৎ সব কিছু রাষ্ট্রের জন্য, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো কিছু নয়, রাষ্ট্রের বাইরে কোনো কিছু নেই।

ফ্যাসিবাদ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাস করে না।

এ মতবাদে গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বীকৃতি নেই। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্র রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। এ ধরনের রাষ্ট্রে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতার পরিবর্তে দায়িত্ব, নিয়মানুবর্তিতা ও আনুগত্যের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ব্যক্তি ও সমাজের যে কোনো ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা যাবে। এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করার কোনো জায়গাও নেই– সুযোগও নেই।

সমগ্র রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করবে মাত্র একটি দল। বিরোধীদল ও বিরোধী মত সহ্য করা হবে না। মিডিয়া সরকারের পক্ষে লিখতে পারবে– বিপক্ষে কোনো কিছু লেখা যাবে না।

এ মতবাদে সরকার ও রাষ্ট্র একীভূত। দলীয়প্রধান, সরকারপ্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধান একই ব্যক্তি। তার আদেশ রাষ্ট্রের আইন বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ এক নেতা, এক দেশ। নেতা সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক ও প্রতীক। মুসোলিনির ভাষায় এ ধরনের রাষ্ট্রের নাগরিকের কর্তব্য হবে কাজ, 'কাজ আর কাজ ও নিয়মানুবর্তিতা– কোনো তত্ত্ব নয়– কোনো দর্শন নয়।'

এ মতবাদ অনুসরণ করে হিটলার নাৎসী দল গঠনের মাধ্যমে জার্মানির ক্ষমতা দখল করেন। তিনি ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেন। ইতালি তার সমর্থনে তার পক্ষে বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

বি. দ্র. ১. মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, ন্যায়পরায়ণ, হিসাব গ্রহণকারী সকল জ্ঞানের আধার, চিরঞ্জীব আল্লাহকে অস্বীকার করে, তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বেচ্ছাচারী ও দায়িত্বহীন হয়ে গেলে তার যে অবস্থা দাঁড়ায় তা হলো :

www.nagorikpathagar.org

সে নিজেকে এক তুচ্ছ বস্তু, (সম্ভবত অপবিত্র তরল পদার্থ) এক যন্ত্র মনে করে। সে যখন ওহির মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করতে রাজি না হয়- তখন তাকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় প্রাকৃতিক জগৎ তথা বন-জঙ্গল থেকে। পশু হয়ে যায় তার উস্তাদ। পশুকে উস্তাদ মানতে তার কোনো আপত্তি নেই। কারণ সে নিজেও তো (unicellular amoeba) এককোষবিশিষ্ট প্রাণী থেকে রূপান্তরিত হয়ে বানরের স্তর পার করে বর্তমান স্তরে উপনীত হয়েছে। ভবিষ্যতে বিবর্তনের মাধ্যমে আরো কোনো প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। আর জঙ্গলের পশুদের মধ্যে তার পছন্দ শিয়াল ও সিংহ। শিয়াল ও সিংহের মতো ধূর্তামি ও হিংস্রতা প্রদর্শন করে সে সাধারণ শ্রেণীর মানুষকে কাবু করে ফেলবে। সে একা না পারলে তোষামোদকারীদেরকে যোগাড় করে মাত্র একটি দল গঠন করে সবার উপর কর্তৃত্ব জাহির করবে। যেহেতু সাধারণ মানুষ বোকা, ভীরু, স্বার্থপর, নীচ মনোভাব সম্পন্ন- ভয় প্রদর্শন করে তাদের কাছ থেকে আনুগত্য আদায় করা যায়, সুতরাং তাদেরকে শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে ভীত সন্ত্রস্ত করে তাদের লর্ড, তাদের প্রভু বনে যাবে। এ কাজ করা তার অপরাধ নয়। কারণ সে শক্তিমান, তার দলবল আছে। সে অন্য সভ্যতার সাথে সংঘাত বাধিয়ে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে টিকে থাকবে। কারণ আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্ট এ বিশ্ব প্রকৃতির নিয়ম হলো Survival of the fittest.

বি. দ্র. ২

খ্রিস্টানদের দুই স্তম্ভ সেন্ট পিটার ও সেন্ট জনপলের দেহাবশেষ রয়েছে ইতালির রাজধানী রোমের সেন্টপিটার কেথিড্রেলে। এ গির্জা খ্রিস্ট জগতের মধ্যমণি। এ গির্জা থেকে গোটা বিশ্বের খ্রিস্টানদের নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই জায়গায় রয়েছে খ্রিস্টানদের ধর্মরাজ্য- ভেটিকান সিটি। পোপ হলেন এ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান। অতীতেও রোম সাম্রাজ্যের সম্রাটগণ ছিলেন খ্রিস্ট জগতের সম্রাট।

কালের আবর্তনে পোপের সাথে সম্রাটদের সংঘাত হয়। অতঃপর পোপ ও যাজকশ্রেণীর সাথে বুদ্ধিজীবীদের সংঘাতের ফলে উদ্ভব হয় সেকুলারিজম। সেকুলারিজমের ফসল বস্তুবাদ, বিবর্তনবাদ, মেকিয়াভেলিবাদ, ফ্যাসিবাদসহ আরো অনেক মতবাদ। বিবর্তনবাদ ব্যতীত বহু মতবাদের জন্মভূমি ইতালি ও গ্রিস। উপরোক্ত মতবাদগুলো আমাদের জাতিসত্তাকে গিলে ফেলতে মুখ ব্যাদান করে আছে।

www.nagorikpathagar.org

ইতালির পার্শ্ববর্তী দেশ গ্রিস।

* গ্রিসে অতীতে বহু দেব-দেবীর পূজা করার সময় উৎসবের আয়োজন করা হতো। দেবদেবী থেকে মঙ্গল কামনায় মোমবাতি জ্বালিয়ে তাদের নিকট প্রার্থনা করা হতো।

* ক্ষতিকর অশরীরী আত্মা তাড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে মাঠে একত্রিত হয়ে আতশবাজি পোড়ান হতো।

* গ্রিক দেবতা লাইকিউস আরগোসের মন্দিরে আগুনের 'শিখা চিরন্তন' সর্বদা জ্বালিয়ে রাখা হতো। তাদের মতে এ 'শিখা চিরন্তন'– চিরজীবনের প্রতীক। এ শিখাকে পূজা করা হতো– স্যালুট করা হতো।

* তাদের জাতীয় বীরকে দেবতার আসন প্রদান করে দস্তুর মতো তার পূজা করা হতো। এসব Pagan (পৌত্তলিক) আমলের গ্রিক সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি এখনও তাদের মধ্যে চালু আছে।

আমরা সাত সমুদ্র তেরো নদীর এপারে অবস্থান করেও এ আগ্রাসী সংস্কৃতির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আটকে পড়ছি কি?

www.nagorikpathagar.org

একাদশ অধ্যায়

বিপর্যস্ত মানবতা

মানুষ আজ একবিংশ শতাব্দীতে উপনীত। বিশ্ব আজ একটি ছোট পল্লীতে (global village এ) পরিণত হয়েছে। মানুষ ধারণাতীত গতি বৃদ্ধি করেছে। সে আজ পৃথিবীর দূরবর্তী স্থানের মানুষের সাথে ঠিক এভাবেই কথা বলতে পারছে, যেভাবে সে তার পাশের লোকের সাথে আলাপ করে। মানুষ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। আজ প্রতিযোগিতা চলছে কার আগে কে চাঁদ কিংবা মঙ্গল গ্রহে হোটেল-মোটেল নির্মাণ করবে আর প্রমোদ ভ্রমণে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে। সম্ভবত মাটির অভ্যন্তরে এমন কোনো সম্পদ নেই, যা সে তুলে আনতে সক্ষম হয়নি। ধারণা করা হয়, সে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে গেছে।

তারপরও মানবতা আজ বিপর্যস্ত। মানুষ সামষ্টিক অর্থে কি সুখ ও শান্তিতে আছে? এর জবাব ইতিবাচক না হয়ে নেতিবচাক হওয়াই স্বাভাবিক।

আজও সেই বৃদ্ধের আহাজারি শোনা যায়, যে তার সকল শক্তি-সামর্থ্য ও মেধা উজাড় করে দিয়ে এখন অসহায়। তার ছেলে-মেয়েদের ছবি মিডিয়াতে সে দেখে, তাদের গলার আওয়াজও ইথারে ভেসে আসে। কিন্তু তাদের সময়ের এতো অভাব যে তাদের পক্ষ থেকে একটি হ্যালো শুনবার সুযোগ তার হয় না। শোনা যায় সেই বৃদ্ধার ক্রন্দন, সুসময়ে বিকশিত তারুণ্যে যার আঙিনায় ভিড় লেগেই থাকতো, কত ভ্রমরের গুঞ্জরণ সে শুনত অথচ আজ তার দিকে ফিরে তাকাবার কেউ নেই। শুনা যায় ক্রন্দন সেই কোটিপতির, যাকে সাময়িক সময় দেয়ার জন্য অনেকেই প্রতিযোগিতা করে। কিন্তু তার অন্তরের অন্তঃস্থলের বেদনাগুলো উপলব্ধি করার কারো সময় নেই, কারো ধৈর্য নেই, কারো হৃদয় নেই। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে দেখা যায় সেই শ্রমিককে, যে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে সোনা কিংবা হীরা অতল তল থেকে আহরণ করে। তার হাতে সামান্য কয়েকটি মুদ্রা তুলে দিয়ে বিদেশিরা তার জন্মভূমির মূল্যবান সম্পদ লুটে নিয়ে যায়। শোনা যায় সেই যুবকের আর্তনাদ যার দিকে তাক করে আছে বিদেশি সৈন্যদের বন্দুকের নল– যাদের ইচ্ছার বাইরে নড়াচড়া করলে খোয়াতে হবে জীবন। শোনা যায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ক্রন্দনরব সেই সৈনিকের, যাকে গুলি করতে আদেশ দেয়া

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে– সে বুঝে গুলি করার পরিণতি কী, যার উপর গুলি আঘাত করবে তার নিজের ও আত্মীয়-স্বজনের কী অবস্থা হবে। কিন্তু সে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না, যাকে গুলি করবে তার কী অপরাধ? বিলাপ শোনা যায় শিশুসদনের সেই অসহায় শিশুর, যে জানে না কে তার মা? কে তার বাবা? কিভাবে সে পৃথিবীতে এলো? কেন সে এলো? কোথায় সে যাবে? তার শেষ পরিণতি কী হবে? দীর্ঘ নিঃশ্বাস শোনা যায় সেই মুমূর্ষু রোগীর, যার শেষ আকুতিগুলো কার কাছে নিবেদন করবে, আজো এ পরিণত বয়সে তার পক্ষে নির্ধারণ করা সম্ভব হলো না।

আরো কত কান্না, কত আহাজারি, কত বিলাপ, কত দীর্ঘশ্বাস ইথারে ভেসে বেড়ায়– শোনার ইচ্ছা থাকলে কান পেতে তা শোনা যায়, উপলব্ধি করার মন থাকলে মর্মে মর্মে তার সুর অনুরণিত হয়।

এবার বিপর্যস্ত মানবতার কারণ চিহ্নিত করে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করা হলো। যাদের উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে– তারা বিশ্বে পরিচিত, বিশ্ব বিখ্যাত।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ফরাসি পণ্ডিত ড. আলেক্সিস ক্যারল তাঁর Man the Unknown গ্রন্থে বলেন :

'প্রতিটি দেশের ক্ষমতাসীন শাসক শ্রেণীর মধ্যে যাদের হাতে ক্ষমতার চাবিকাঠি রয়েছে– মানসিক ও নৈতিক যোগ্যতার দৃশ্যমান অবনতি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আমরা অনুভব করছি, আধুনিক সভ্যতা সেসব বড় বড় আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যা মানবতা তার প্রতি পোষণ করেছে এবং সে সমস্ত লোক জন্ম দিতে পারেনি যারা মেধা ও সাহসিকতার অধিকারী হবে এবং সভ্যতাকে সে কষ্টকর দূরাতিক্রম্য রাস্তায় নিরাপদ শান্তির সাথে নিয়ে যেতে পারবে, যেখানে মানবতা আজও ঠোকর খাচ্ছে।...

প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-প্রযুক্তি মানুষের জন্য যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, তা মানুষ উপযোগী নয় এবং সুপরিকল্পিতভাবেও স্থাপিত হয়নি।...

আমরা এক অব্যাহত নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অধঃপতনের সাথে নিপতিত। যেসব জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রযুক্তি-সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করছে ও চরম উন্নতি লাভ করেছে, তারা আগের তুলনায় খুবই দুর্বল এবং খুব দ্রুততার সাথে অসভ্যতা ও বর্বরতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু তাদের এই অনুভূতি নেই... আমরা বস্তুবাদ সম্পর্কে যতটা জানি এর তুলনায় জীবনের জ্ঞান এবং মানুষের কিভাবে জীবন অতিবাহিত করা দরকার এ সম্পর্কে খুব কমই জানি। আমাদের জ্ঞান এ সম্পর্কে খুব পেছনে পড়ে রয়েছে। আর এ কম জানার কারণে আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি।

www.nagorikpathagar.org

এর ফলে আমরাই ভুগছি।...

... আমাদের জন্য তো এটাই সমীচীন ছিল যে, আমরা নিজের দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করি ও মনোযোগ দিই। যান্ত্রিক, প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধ্য নেই যে, সে আমাদেরকে মেধা ও বুদ্ধিমত্তা দান করতে পারে, দান করতে পারে নৈতিক শৃঙ্খলা, চারিত্রিক বিধান, স্বাস্থ্য, স্নায়ুবিক ভারসাম্য, শান্তি ও নিরাপত্তা।'

Guide to Modern Wickedness গ্রন্থে অধ্যাপক Joad বলেন–

'সমসাময়িক যুগের সমাজ ও সোসাইটির বিশ্বাস ছিল– আরামপ্রিয়তার নামই হলো সভ্যতা। কিন্তু এ যুগের বিশ্বাস হলো দ্রুততা তথা গতির নাম সভ্যতা।

গতি হলো বর্তমান কালের যুবকদের আরাধ্য। এর মণ্ডপ ও মন্দিরে তারা আরাম, প্রশান্তি ও দয়া-মায়াকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে বলি দেয়।...

উড়োজাহাজ দেখুন, যারা এটা আবিষ্কার করেছিল তাদের উচ্চ মনোবল, অটুট সংকল্প, ইচ্ছাশক্তি ও দুঃসাহস অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল। কিন্তু এখন আপনি সে সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করুন যার আওতাধীনে এ উড়োজাহাজ ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে– সে সব উদ্দেশ্য, লক্ষ্য কি? তা হলো– আকাশ থেকে বোমা বর্ষণ, মানবদেহ খণ্ড-বিখণ্ডকরণ, জীবিতদের জীবন হরণ, মানবদেহ ভস্মীভূতকরণ, বিষাক্ত গ্যাস নিক্ষেপণ ও প্রতিরক্ষায় অসমর্থ দুর্বল মানুষগুলোকে ধ্বংসকরণ।'

ইউরোপের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও দার্শনিক ধর্মান্তরিত মুসলমান (লিওপোল্ড) মুহাম্মদ আসাদ তাঁর Islam At The Cross-Road বইতে লেখেন– 'ইউরোপের মানুষের একটি দল সৃষ্টি হয়ে গেছে, যাদের নীতিবোধ ও নৈতিকতা নিছক উপযোগবাদের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ। যাদের কাছে ভালো-মন্দের সর্বোচ্চ মাপকাঠি হচ্ছে একমাত্র বস্তুবাদী সাফল্য।'

Man The Unknown গ্রন্থের আর একটি উদ্ধৃতি– 'এ কালের মতাদর্শ পূজারিরা মানবতার কল্যাণের জন্য সভ্যতার নানা ভিত্তি স্থাপন করেছে। তারা মানুষের অসম্পূর্ণ ও কুৎসিত ছবি এঁকেছে।... প্রতিটি ব্যাপারে পরিমাপের মানদণ্ড হওয়া উচিত ছিল স্বয়ং মানুষ। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তার সম্পূর্ণ বিপরীত।... আসলে আমরা বড় হতভাগ্য। কেননা আমরা বিবেক, বুদ্ধি ও নৈতিকতা উভয় দিক দিয়েই ক্ষয়িষ্ণু ও বিলয়মুখী। যে সব জাতি বর্তমানে সভ্যতার শীর্ষস্থানে পৌঁছে গেছে, একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে যে, তারা দুর্বলতার শিকার।

www.nagorikpathagar.org

বরং দুনিয়ার সমগ্র জাতির মধ্যে চরম উন্নত জাতিগুলোই পুনরায় বর্বরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা অবলম্বন করে বসছে।'

আমেরিকার নিহত প্রেসিডেন্ট জন. এফ. ক্যানেডি ১৯৬২ সালে এক গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতিতে বলেছিলেন– 'আমেরিকার ভবিষ্যৎ বিদাপন্ন, কেননা নব্য যুবকরা যৌন চর্চার পঙ্কিলতায় এত বেশি নিমজ্জিত যে, তারা নিজেদের দায়িত্বের বোঝা বহন করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। সামরিক বাহিনীতে যোগদান করার জন্য আসা প্রতি সাতজন যুবকের মধ্যে ছয় জনই ব্যর্থকাম হয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। কেননা যৌন লালসা-কামনা তাদের দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থাকে সাংঘাতিকভাবে পর্যুদস্ত করে দিয়েছে। বৈদেশিক মন্ত্রণালয় থেকে ৩৩ জন কর্মীকে বহিষ্কার করা হয়েছে, শুধু এই জন্যই যে, তারা যৌনতার ক্ষেত্রে চরম উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল। আর এ কারণে সরকারি গোপনীয়তা সংরক্ষণের দিক দিয়ে তারা মোটেই নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হচ্ছিল না।'

Dr. Cyril Garbett বলেন :

'বর্তমানে মানুষ ইতিহাসের জটিলতম সঙ্কটে নিপতিত। সভ্য মানুষ আজও বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সে এমন এক খাড়া স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে থেকে এক ধ্বংস গহ্বরে পড়ার আশঙ্কার রয়েছে। সেখানে পড়ার পর হয়ত উদ্ধার পাবার আর কোনো উপায় কোনো দিনই খুঁজে পাবে না।'

Stah Wood Cobb বলেন :

'আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতা অনেকগুলো অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য ও অসামঞ্জস্যে পরিপূর্ণ। এই বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয় কথা ও কাজের মধ্যে, চিন্তা ও বক্তব্যের মাঝে এবং যুক্তি ও অনুভূতির মধ্যে। বস্তুবাদী সভ্যতা নানান ধরনের অভিব্যক্তির মাঝে সকল মানুষের নীতিগত সাম্যের কথা ঘোষণা করেছে, কিন্তু কার্যত নৈতিক বুদ্ধিবৃত্তিক সামাজিক পরিসরে অসাম্য ও অবিচারের জন্ম দিচ্ছে এবং এই মন্দগুলোকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছে।'

দার্শনিক কবি ড. আল্লামা ইকবাল তাঁর Reconstruction of Religious Thought in Islam বইতে লেখেন :

'এ কালের মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে আর হৃদয়বান হিসেবে জীবনযাপন করতে পারছে না। চিন্তার জগতে সে নিজেই নিজের বিরুদ্ধে লড়ছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে অপরের সাথে সংঘাতরত। বাস্তব ঘটনার বেড়াজালে আটকে পড়ে সে তার আপন সত্তার গভীরতা থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে

www.nagorikpathagar.org

পড়েছে।'

'স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের (ওহি) নিয়ন্ত্রণ মুক্ত চিন্তাশক্তি এবং বিশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত বিজ্ঞানী আধুনিক মানুষকে দিয়েছে নির্মম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অন্যায় সমাজ ব্যবস্থা, নির্দয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা, শ্রেণীতে শ্রেণীতে লড়াই এবং ক্ষমতা দখলের উন্মাদনা।'

পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারের পর অধ্যাপক বার্বাস এর ধ্বংসাত্মক কার্যকারিতার কথা চিন্তা করে বলেছিলেন– 'বাধ্যতামূলকভাবে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা অনুশীলন না করলে মানবসভ্যতা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। কারণ মানুষ ধ্বংসের উপকরণ অনেক বেশি যোগাড় করে ফেলেছে।' তিনি উপলব্ধি করেছিলেন পারমাণবিক বোমার নিয়ন্ত্রণ ভার কোনো অবস্থাতেই সেকুলার চিন্তাধারার লোকদের হাতে দেয়া যাবে না। এ বোমার নিয়ন্ত্রণ ভার অবশ্যই ধার্মিক ও নৈতিকতাসম্পন্ন লোকদের হাতে অর্পণ করতে হবে।

এবার কিছু তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশিত হচ্ছে এ থেকে ধারণা করা সম্ভব হবে মানবতার বিপর্যয় আজ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে।

আজ যদি বিশ্ববাসীর গণভোট নেয়া হয় এই প্রশ্নে যে, মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রিয়বস্তু কোনটি? নিঃসন্দেহে উত্তর আসবে তার নিজের জান, নিজের প্রাণ।

মানুষের সবচেয়ে প্রিয়বস্তু এ প্রাণ একটি পবিত্র আমানত। যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া তা হরণ করা যায় না। অথচ বর্তমান কিংবা বিগত শতাব্দীতে কত মানুষের প্রাণ বিনা দোষে, বিনা কারণে কেড়ে নেয়া হয়েছে, ইতিহাস তার পূর্ণ তালিকা সংরক্ষণ করেনি। তারপরও ছিটেফোঁটা কিছু হিসাব বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া যায়, তার উপর ভিত্তি করে কিছু তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো :

* জাপানের হিরোশিমা পৌরসভার চেয়ারম্যান ১৯৪৯ সালের ২০ আগস্ট এক ঘোষণায় বলেন, ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট আমেরিকার নিক্ষিপ্ত এটম বোমায় যেসব বনি-আদম মারা যায় তাদের সংখ্যা দুই লাখ দশ থেকে চল্লিশ হাজার, আর আহত হয় ৮০ হাজার।
* আর জাপানের নাগাসাকিতে এটম বোমার আঘাতে নিহত হয় ৪০ হাজার এবং আহত হয় ২০ হাজার মানুষ। নিহত ও আহতদের চেয়ে বেশি সংখ্যক লোক পরবর্তী পর্যায়ে এটম বোমার তেজস্ক্রিয়তার কারণে সারাটা জীবন কোনো না কোনো অসুখে, দুঃখ-কষ্টে অতিবাহিত করে।
* প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪ সালে আরম্ভ হয়। এ যুদ্ধে ১ কোটি ৩০ লাখ লোক

www.nagorikpathagar.org

নিহত হয়, আর আহত হয় ২ কোটি ২০ লাখ।

* A.J.P Teylor তার The First World War বইতে উল্লেখ করেন– প্রথম বিশ্বযুদ্ধে–

ফ্রান্স হারায়– ১৫ লাখ লোক।

জার্মানি হারায় ১৫ লাখ লোক

ব্রিটেন হারায় ১০ লাখ লোক।

আমেরিকা হারায় ৮৮ হাজার লোক

রাশিয়া হারায় সবার যোগফল থেকেও বেশি সংখ্যক লোক।

* Western Civilization বই এর হিসাব অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিন কোটি ৫০ লাখ লোক নিহত হয়েছে এবং ২ কোটি লোক পঙ্গুত্ব বরণ করেছে।

বি.দ্র. Neo Clear Weapons নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে, বর্তমানে পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী দেশগুলোর হাতে যে পারমাণবিক অস্ত্র মজুদ আছে, সেগুলোর শক্তি হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত বোমার শক্তির প্রায় ১০ লক্ষ গুণের সমান।

আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জুনিয়র বুশ ইরাক ও আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালিয়ে কত নিরপরাধ মানুষ হত্যা করেছে, ফিলিস্তিনে কত মানুষ নিহত হচ্ছে তার সংখ্যা বেসুমার।

বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে আল্লাহর দুনিয়ায় যে ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালিত হলো, তাতে যে কোটি কোটি বনি আদম নিহত হলো, তাদেরকে কোনো মানুষ পয়দা করেনি। তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন বিশ্ব জগতের মালিক মহান আল্লাহ তায়ালা। নিহতরা হতে পারে হিন্দু বা মুসলমান, বৌদ্ধ কিংবা খ্রিস্টান, নগরবাসী বা পল্লিবাসী, আর্য জাতি কিংবা উপজাতি– এরা সবাই আল্লাহর খলিফা, তাঁর নিজের প্রতিনিধি, বিনা কারণে তাদের প্রাণ সংহারের কারো কোনো অধিকার নেই।

যারা এ অপরাধ সংঘটিত করলো, যারা এ অপরাধের ষড়যন্ত্র করল, যারা পরিকল্পনা গ্রহণ করল, যারা হুকুম দিল– তাদের সবাই সেকুলার চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। এরা যদি সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী হতো, তবে তারা আল্লাহকে ভয় করতো, তারা আল্লাহর এত সংখ্যক খলিফা, তাঁর প্রতিনিধিকে হত্যা করতো না, এত সংখ্যক লোক আহত হতো না, এত সংখ্যক নারী বিধবা হতো না, এত সংখ্যক শিশু এতিম হতো না, এতটি পরিবার অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতো না।

এ নরঘাতকেরা ইহজগৎবাদী সেকুলার। তারা আখিরাত পুনরুত্থান, শেষ বিচার,

www.nagorikpathagar.org

বেহেশত ও দোযখে বিশ্বাসী ছিল না। যদি তাদের বিশ্বাস থাকত, তাহলে তারা কোনো দিন এ পথে অগ্রসর হতো না। মানবতা এ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতো না।

একজন লোক একজন মানুষকে অকারণে হত্যা করলে তাকে বিচারের মাধ্যমে ফাঁসি দেয়া হয়। যে ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ লোক হত্যা করল তাকে একবারের বেশি ফাঁসি দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এ দু'জনের অপরাধের মাত্রা সমান নয়। তাহলে ইহজগতে চাইলেও সত্যিকার অর্থে ইনসাফ কায়েম করা সম্ভব নয়। ইনসাফ একমাত্র আল্লাহ্ করতে পারেন। আর এ জন্যই আখিরাতের প্রয়োজন। শেষ বিচারের প্রয়োজন। প্রয়োজন বিভিন্ন ক্যাটাগরির দোযখের। আল্লাহ তার ব্যবস্থা করেছেন, পরিমাণ মতো সব ঠিকঠাক করে রেখেছেন।

পারিবারিক বিপর্যয়

মানুষ বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগৎ পারিবারিক ক্ষেত্রে কি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে তার ছিটেফোঁটা চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে :

পরিবার হচ্ছে সভ্যতার ভিত্তি। স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়েদেরকে নিয়ে সাধারণত পরিবার গঠিত হয়। পরিবারের মাধ্যমে বংশধররা ও সভ্যতা অগ্রসর হয়। সভ্যতার এ প্রাথমিক ভিত্তি পরিবার আজ হুমকির সম্মুখীন।

আজ পর্যন্ত নিম্নোক্ত দেশসমূহে আইন সভায় আইন পাস করে সমলিঙ্গের মধ্যে (পুরুষে পুরুষে) বিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে এ জাতীয় বিয়ের মাধ্যমে কি সন্তানের জন্ম হবে? বংশধারা অব্যাহত থাকবে? মানব সভ্যতা টিকে থাকবে? যে সব দেশে সমলিঙ্গের মধ্যে বিয়ে বৈধ ও আইন সঙ্গত এগুলো হলো : আমেরিকা, কানাডা ও ইউরোপের কয়েকটি দেশ।

এছাড়া উভলিঙ্গের মধ্যে বিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটছে। বিয়ে হয়েছে তালাক হয়নি অথচ স্বামী-স্ত্রী আলাদা বসবাস করছে এদের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়।

এছাড়া নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহবহির্ভূত মিলনের সংখ্যা নির্ণয় করা আজকাল humanly impossible হয়ে গেছে। জন্ম নিরোধক সরঞ্জামের এতো ছড়াছড়ির পরও কোটি কোটি কুমারী মাতৃত্ব বরণ করছে। ফলে সমসংখ্যক জারজ সন্তান জন্ম নিচ্ছে।

The Crisis of Our Age গ্রন্থে পি.এ সরোকিন বলেন- 'পারিবারিক পরিবেশ এখন শুধু একত্রে রাত্রিযাপনেই পরিণত হয়েছে। তাও আবার প্রত্যেক রাতের

www.nagorikpathagar.org

জন্য নয়। এমনকি সব সময় এক রাতের সবটুকু সময়ের জন্য নয়।'

জর্জ র‍্যালি স্কট তাঁর A History of Prostitution গ্রন্থে বলেন– 'যে সকল নারী তাদের দেহ ভাড়া দেয়াকে তাদের জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাদের বাদ দিলেও আর এক শ্রেণীর নারী আছে এবং তাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে– তারা জীবনের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লাভ করার জন্য অন্যান্য উপায় অবলম্বন করে থাকে এবং অতিরিক্ত রোজগারের জন্য ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। পেশাদার বেশ্যা ও এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।'

পারিবারিক বিপর্যয় সৃষ্টিতে কিছু পাশ্চাত্য পণ্ডিত আগুনে ঘি ঢেলেছেন। তাদের একজন হচ্ছেন দরখায়েম। তার বক্তব্য– 'নারীর বিয়ে করা তার স্বাভাবিক দাবি নয়।'

অন্য পণ্ডিত ফ্রয়েড বলেন– 'নারীর যৌন সত্তা অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হতে হবে সকল প্রকার বাধা-বন্ধন মুক্ত হয়ে।'

ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবী George Sand বলেন– 'জগৎকে যতটুকু দেখার আমার সুযোগ হয়েছে তাতে আমি অনুভব করি প্রেম সম্বন্ধে আমাদের যুবক-যুবতীদের ধারণা কতখানি ভ্রান্ত। প্রেম শুধু একজনের জন্য হতে হবে অথবা তার মন জয় করতে হবে এবং তাও চিরদিনের জন্য– এরূপ ধারণা নিতান্তই ভুল।'

আর এক বুদ্ধিজীবী তার স্ত্রীকে সামনে রেখে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা শুনলে গায়ে শিহরণ জাগে। তিনি বলেন– 'যে ফুল আমাকে ব্যতীত অন্যকে তার সুরভি দান করতে চায় তাকে পদদলিত করার আমার কি অধিকার আছে?'

জার্মান পণ্ডিত Babel বলেন– 'নারী ও পুরুষ তো পশুই। পশু দম্পতির মধ্যে কি কখনো স্থায়ী বিয়ের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়?'

এ রকম প্রচারণার ফলশ্রুতিতে যা ঘটছে তার কিছু তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হলো :

আমেরিকান National Crime Victimization Survey এর রিপোর্ট : '১৯৯৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে প্রায় দু'লাখ। গড়ে প্রায় আড়াই মিনিটে একটি ধর্ষণ হয়।' Microsoft এর বিশ্বকোষে উল্লেখ করা হয়েছে– 'যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমিক স্কুলের উপর পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে ২৩% থেকে ৪৮% ছাত্রী তাদের ছেলে বন্ধুদের দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে।' কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র এর চেয়ে করুণ।

সুইডেনের ৯৯% লোক বিয়ের আগে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। যুক্তরাষ্ট্রের যৌনক্ষম নারী-পুরুষের মধ্যে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় ৯৫% লোক

www.nagorikpathagar.org

বিয়ের আগে যৌন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। (সূত্র : Pre-Marital Sex-The Norms in America) অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য যৌন সম্পর্ক স্থাপনের কারণে জন্ম নিরোধক সরঞ্জাম ব্যবহার সত্ত্বেও অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ অস্বাভাবিক হারে বেড়ে চলছে। Social Psychology Understanding Human Interaction বইতে উল্লেখ আছে– '১৯৭৮ সালে শুধু আমেরিকায় ১০ লাখ অবাঞ্ছিত গর্ভধারণের ঘটনা ঘটে। ১৯৯৬ সালে শুধু আমেরিকায় ১৩ লাখ ৬৫ হাজার ৭ শত ত্রিশটি গর্ভপাত ঘটানো হয়। ইংল্যান্ডে ২০০৬ সালে ১ লাখ ৯৩ হাজার ৭ শত গর্ভপাত ঘটানো হয়। (সূত্র : Abortion Statistics England and Wales 2006)

গর্ভপাত বৈধ হয় রাশিয়ায় ১৯২০ সালে, জাপানে ১৯৪৮ সালে। ১৯৬০-৭০ সালের মধ্যে সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকায় গর্ভপাত আইনের মাধ্যমে বৈধতা লাভ করে। স্বাস্থ্যগত কিংবা অন্য কোনো কারণে যারা গর্ভপাত ঘটায় না তাদের অবৈধ সন্তান জন্ম দিতে হয়। The World Almanar এর সূত্রমতে ১৯৯৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে যত শিশু জন্ম হয়েছে তার মধ্যে ৩২.৮% জারজ সন্তান অর্থাৎ মোট শিশুর ৩ ভাগের ১ ভাগ অবৈধ সন্তান।

জারজ সন্তানদের অধিকাংশই মা প্রতিপালন করে না। ফলে তাদেরকে শিশু সেবা কেন্দ্র কিংবা দত্তক প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে হয়। ওরা ওখানে সব পেতে পারে, কিন্তু মায়ের আদর থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে পরবর্তী জীবনে তাদের অধিকাংশ সমাজ বিরোধী কিংবা সমাজ বিদ্বেষীতে পরিণত হয়।

১৯৯৪ সালে বিশ্বব্যাংকের এক জরিপে বলা হয়– নরওয়ে, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, বার্বাডোজ ও নেদারল্যান্ডে নারীদের প্রতি তিনজনে একজন শৈশবে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এদের অধিকাংশ সৎ পিতার দ্বারা আক্রান্ত হয়।

২০০০ সালের আদমশুমারির পর রিপোর্ট করা হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের সমকামী (Homosexual) লোকের সংখ্যা ১ কোটি (সূত্র : Sociology P-342, By Richard T Schaefer)

আমেরিকায় পাঁচ লক্ষ পেশাদার পতিতা এবং সমসংখ্যক Part-time (খণ্ডকালীন) পতিতা রয়েছে। Part-time পতিতাদের অধিকাংশই সুশিক্ষিতা এবং সমাজের সম্মানিতা নারী। (সূত্র : Abnormal Psychology And Modern Life, By James C. Coleman)

নগ্ন হয়ে বিচরণ (Exhibitionism) যৌন বিকৃতির আর এক রূপ। সমুদ্র সৈকত, সুইমিংপুল ও পার্কে এখন নগ্ন হয়ে চলাফেরা প্রায় স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

www.nagorikpathagar.org

২০০৩ সালে ভার্জিনিয়ার হোয়াইট টেইল পার্কে ঘোষণা করে সাড়ম্বরে তরুণ-তরুণীদের নগ্ন Camp অনুষ্ঠিত হয়। এ রকম ক্যাম্প এর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

বিবাহিত নারী-পুরুষ তার জোড় ব্যতীত অন্যদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করছে– এদের সংখ্যা আমেরিকায় মোট বিবাহিতদের এক তৃতীয়াংশ। এটা ১৯৭৮ সালের এক জরিপ রিপোর্ট। (সূত্র : Marriage and Family Development, By Evelyn Millis Duvall)

পরকীয়া প্রেমের কারণে স্ত্রীর কোলে যে শিশু আসে, স্বামী সন্দেহ করে এ শিশু তার নয়। এ কারণে সেখানে শিশু নির্যাতন দিন দিন বেড়ে চলছে।

– 'আমেরিকায় প্রতিবছর দশ থেকে বিশ লাখ শিশু পদাঘাতের শিকার হয় তাদের পিতা-মাতা কর্তৃক। আর পরিবার সদস্যদের মধ্যে হত্যাকাণ্ড, অন্য যে কোনো প্রকার হত্যাকাণ্ডের চেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়।

(সূত্র : Mal Adoptive Behaviour : An Introduction to Abnormal Psychology Scott, Foresman & CO. U.S.A)

এ বইতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে– 'সামগ্রিক পর্যালোচনা এ ইঙ্গিত করে যে, পায় ২০ লাখ স্বামী ও সমসংখ্যক স্ত্রী একে অন্যকে বছরে অন্তত একবার আক্রমণ করে। এর মধ্যে প্রায় আড়াই লাখ প্রহারের ঘটনা মারাত্মক হয়ে থাকে। প্রহারের ঘটনায় নারীরা সাধারণত পুরুষের চেয়ে বেশি আহত হয়ে থাকে।'

আমেরিকায় যত বিবাহ হয় তার প্রায় অর্ধেক বিচ্ছেদে পরিণত হয়। বিয়ে করে একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে যায় এমন ঘটনা প্রায় ঘটছে। প্রতিবছর সঙ্গী ত্যাগের ঘটনা প্রায় দশ লাখ। (সূত্র : Marriage and Family Development)

আমেরিকায় মোট শিশুর এক তৃতীয়াংশ পিতা-মাতা উভয়ের সাথে বসবাসের সুযোগ পায় না। (সূত্র : Social Psychology Understanding Human Interaction, By Robert A. Baron, Donn Byrne)

পারিবারিক বিপর্যয়ের কারণে সৃষ্টি হয় মানসিক সমস্যা। ২০০৪ সালে আমেরিকার মানসিক ব্যাধির উপর এক সমীক্ষা চালানো হয়। এতে দেখা যায় ২ কোটি ৯০ লাখ লোক Mood disorder এবং ৪ কোটি লোক Anxiety Disorder এ ভুগছে।

(সূত্র : Diagonostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 4th edition U.S.A)

www.nagorikpathagar.org

আমেরিকায় যৌন রোগে ভুগছে মোট জনসংখ্যার এক দশমাংশ। এর সাথে প্রতিবছর যোগ হচ্ছে প্রায় ৫ লাখ নতুন রোগী। (সূত্র : Social Psychology : Understanding Human Interaction)

বিশ্বে আজ AIDS মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। এ রোগের কোনো ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। সুতরাং যার AIDS হয়েছে, সে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। বর্তমান বিশ্বে HIV/AIDS এ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা তিন কোটি ৩২ লাখ।

* এ পর্যন্ত বিশ্বে প্রায় ৩ কোটি লোক এইডসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। ২০০৮ সালে নতুনভাবে আক্রান্ত AIDS রোগীর সংখ্যা প্রায় ২৫ লাখ।
* ২০০৮ সালে এইডস রোগের মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ২১ লাখ।
* ২০০৮ সালে প্রতিদিন গড়ে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ৬৮০০ জন। অর্থাৎ প্রতি মিনিটে আক্রান্ত হচ্ছে প্রায় ৫ জন।
* ২০০৮ সালে প্রতিদিন গড়ে মারা গেছে ৫ হাজার সাতশত জন। অর্থাৎ প্রতি মিনিটে মারা গেছে গড়ে ৪ জন।

বি. দ্র. উপরোক্ত তথ্যগুলো সিলেটের সিভিল সার্জন মহোদয়ের নিকট থেকে প্রাপ্ত।

আত্মহত্যা

১৯৫০ সালের পর থেকে মার্কিন তরুণ-তরুণীদের মধ্যে আত্মহত্যা ৬০০% বৃদ্ধি পেয়েছে। (সূত্র : Abnormal Psychology and Modern Life)

জাপানি তরুণীরা আত্মহত্যার ব্যাপারে আরো অগ্রসর। তারা প্রতিবছর দল বেঁধে একসাথে আত্মহত্যা করে।

মাদকাসক্তি

আমেরিকায় প্রতিবছর ২ লাখ লোক নতুন মাদকাসক্তের তালিকায় শরিক হচ্ছে। যারা সাধারণ মদখোর, তাদেরকে বাদ দিয়েই এ তালিকা।

(সূত্র : Abnormal Psychology and Modern Life)

www.nagorikpathagar.org

অপরাধ প্রবণতা

The World Book of Encyclopedia, Crime এ উল্লেখ আছে যে, ১৯৬০ সালের পর থেকেই আমেরিকায় বিভিন্ন অপরাধ ৪০০% বৃদ্ধি পেয়েছে। সেখানে প্রতি ২ সেকেন্ডে একটি গুরুতর অপরাধ (Serious Crime) এবং প্রতি ১৬ সেকেন্ডে ১টি মারাত্মক অপরাধ (Violent Crime) সংঘটিত হয়।

২০০৭ সালের ১৫ অক্টোবর জাতীয় দৈনিক মানবজমিনে একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনামে ছিল 'বৃটেনে টিউশন ফি বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা যৌন পেশায় নেমেছে।'

২০০৭ সালে বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকা News Week আমেরিকার নারীদের উপর একটি জরিপ রিপোর্ট প্রকাশ করে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়- প্রতি সেকেন্ডে একজন নারী নির্যাতনের শিকার হয়। প্রতি ৬ মিনিটে ১ জন ধর্ষণের শিকার হয়, প্রতি ঘন্টায় ১৬ জন নারীকে ধর্ষণের মোকাবিলা করতে হয়।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের স্ত্রী, আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিনেটর হিলারি ক্লিনটন ১৯৯৬ সালে 'It takes village' নামে একটি বই লেখেন। বইতে তিনি উল্লেখ করেন- 'বছরে প্রায় সাত হাজার শিশু খুন ও আত্মহত্যার শিকার হয়। প্রতি চার শিশুর একজন অবিবাহিতা মায়ের ঘরে জন্ম নেয় যে মা'দের বেশির ভাগ স্বয়ং অপ্রাপ্ত বয়স্কা।

* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫৪% মহিলা তাদের স্বামীদের চেয়ে কুকুরকে বেশি ভালোবাসে।
* চিলির নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কবি জেব্রিয়েলা মিস্ট্রান বলেন- 'যে সমাজে ১২ বছর বয়সীরাও সন্তান জন্ম দেয় এবং ১৫ বছর বয়সীরা একে অন্যকে খুন করে, সে সমাজ টিকে থাকতে পারে না।'

বি. দ্র. সেকুলার চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে বর্তমানে যে সমাজ ও রাজনৈতিক দর্শন চালু হয়েছে তার ফলে মানবসমাজ সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে, এ ব্যাপারে পৃথক বই লেখা যেতে পারে। কলেবর বৃদ্ধি না করে আপাতত এ অধ্যায় এখানে শেষ করা হলো।

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম বিশ্বে সেকুলারিজম

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে সেকুলারিজম প্রাচ্যদেশীয় মতবাদ নয়। এটা মানবমস্তিষ্কপ্রসূত সম্পূর্ণ একটি পাশ্চাত্য মতবাদ। ইউরোপের রেনেসাঁ যুগে এ মতবাদের জন্ম হয়। মুসলিম বিশ্বে এমন কিছু নেতা ছিলেন যারা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করতেন। তাদের একজন কামাল আতাতুর্ক। তিনি সর্বপ্রথম তুরস্কে সেকুলারিজম আমদানি করেন। তিনি তুরস্কের সেনাপ্রধান ছিলেন।

১৯২২ সালে কামাল আতাতুর্ক উসমানী সালতানাতের পতন ঘটিয়ে তুরস্কের রাষ্ট্রপতির পদ দখল করেন।

১৯২৩ সালের ২৯ অক্টোবর তিনি আইনের মাধ্যমে 'খিলাফতের' বিলুপ্তি ঘোষণা করে তুরস্ককে একটি সেকুলার রাষ্ট্রে পরিণত করেন। অথচ খোলাফায়ে রাশেদার যুগ থেকে মুসলিম বিশ্বে 'খিলাফত ব্যবস্থা' চালু ছিল। খলিফা ছিলেন সমগ্র মুসলিম বিশ্বের প্রধান। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানরা 'খিলাফত আন্দোলন' করেছিলেন খিলাফত ব্যবস্থা সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে।

- এই সালে কামাল আতাতুর্ক মুসলিম পারিবারিক আইন পরিবর্তন করে সেকুলার পারিবারিক আইন চালু করেন। ১৯২৫ সালে তিনি হিজরি সাল গণনার পরিবর্তে খ্রিস্টীয় সাল গণনা শুরু করেন।
- তিনি আইন করে মুসলিম পুরুষদেরকে তাদের ঐতিহ্যবাহী ফেজুটুপি বাদ দিয়ে হ্যাট পরতে বাধ্য করেন। অন্যদিকে মহিলাদেরকে বোরখা ও হিজাব বাদ দিয়ে ইউরোপীয় স্টাইলে স্কার্ট পরতে এবং মাথা খোলা রাখতে বাধ্য করেন।
- তিনি ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মাদরাসা বন্ধ করে দিয়ে পাশ্চাত্য কায়দায় বাধ্যতামূলক সেকুলার শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেন।

১৯২৬ সালে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জমানা থেকে চালু হয়ে আসা ইসলামী আইনের পরিবর্তে

www.nagorikpathagar.org

সুইস দেওয়ানি আইন (civil code)

ইতালীয় ফৌজদারি আইন (penal code)

ও জার্মান বাণিজ্য আইন (commercial code) জারি করেন।

১৯২৮ সালে তিনি আরবি হরফের পরিবর্তে ল্যাটিন বর্ণমালায় তুর্কি ভাষা লিখতে বাধ্য করেন। তিনি আইন প্রয়োগ করে আরবি ভাষায় আজান প্রদান ও কুরআন তেলাওয়াত বন্ধ করে দেন। তিনি তুর্কি ভাষায় আজানের বিকল্প চালু করেন এবং নাম দেন 'তানরে উলুদুর' ধ্বনি।

– তিনি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের মেহমানদারিতে এবং রাষ্ট্রের কর্মচারীদেরকে হাত দিয়ে খাবার গ্রহণ নিষিদ্ধ করেন এবং কাঁটা চামচ দিয়ে খাওয়া বাধ্যতামূলক করেন।

১৯৩৪ সালে কামাল আতাতুর্ক মসজিদের বাইরে পাগড়ি ও আভা (ইমামের পোশাক) পরিধান করা নিষিদ্ধ করেন।

– একই সালে তিনি আরবি ও ইসলামী ধারার পরিবর্তে ইউরোপীয় ধারায় প্রথম নাম (Surname) রাখতে প্রত্যেক নাগরিককে বাধ্য করেন।

১৯৩৫ সালে তিনি সাপ্তাহিক ছুটি জুমাবারের পরিবর্তে রবিবার নির্ধারণ করেন।

– তিনি তুর্কি নাগরিকদেরকে ইসলামী জীবনপদ্ধতির পরিবর্তে ইউরোপীয় জীবনপদ্ধতি (life style) গ্রহণ করতে বাধ্য করেন।

– কমাল আতাতুর্ক গর্বভরে ঘোষণা করেন– 'আমরা বিজ্ঞান ও সভ্যতাকে জীবন ও শক্তির আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করি এবং সেকুলারিজমের নীতিকে বাঁচার একমাত্র অবলম্বন মনে করি।'

১৯৩৮ সালের ১০ নভেম্বর মোস্তফা কামাল পাশা ওরফে কামাল আতাতুর্ক মৃত্যুবরণ করেন।

বি. দ্র. উপরোক্ত তথ্যগুলো The new Encyclopaedia Britannica Volume I & Volume 28 (15th edition 2005) থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

– তার পিতার রাখা নাম মোস্তাফা কামাল পাশা থেকে কামাল 'মোস্তাফা' অংশটি বাদ দেন এ যুক্তিতে যে, 'মোস্তাফা' হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা (সা.) এর নামের অংশ ছিল।

www.nagorikpathagar.org

- মৃত্যুর আগে তিনি লাশের জানাজার নামাজের আয়োজন করতে এবং কাফন পরিয়ে ইসলামী কায়দায় কবর দিতে নিষেধ করেন। ফলে তার লাশকে স্যালুট করে গর্তে ঢুকিয়ে রাখা হয় এবং তার উপর সৌধ নির্মাণ করা হয়। তার সমাধি অভ্যন্তরে এক বিরাটকার মূর্তি বানিয়ে রাখা হয়েছে।

তুরস্কের তিনটি রাজনৈতিক দলকে বেআইনি করা হয়েছে– এ অজুহাতে যে, এ দলগুলো তুরস্কের সেকুলার চরিত্র পরিবর্তন করে ফেলতে পারে :

১৯২৫ সালের ৩ জুন Progressive Republic Party

১৯৯৮ সালে Turkish welfare party এবং

২০০১ সালে Virtue Party'র কার্যক্রম বন্ধ করা হয়। Virtue Party'র প্রধান নাজমুদ্দিন আরবাকান ছিলেন তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী। সে দেশের সেনাবাহিনী তাঁকে জেল খাটতে বাধ্য করে।

১৯৯৯ সালে মারভী কাভাকাচি নামে একজন জনপ্রিয় মহিলা নির্বাচনে জয়ী হয়ে পার্লামেন্ট সদস্য হয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি মাথায় স্কার্ফ পরতেন, তাই তাকে শপথ নিতে দেয়া হয়নি। তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায়।

তুরস্কের বর্তমান Ruling Party-Justice & Development Party কে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এ দলকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য একবার ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছিল।

তুরস্কের স্কার্ফ পরিধানকারী কোনো মহিলা সরকারি চাকরি করতে পারে না, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে পারে না। মাথা ঢেকে কোনো মহিলা (সন্তানের অভিভাবক হিসেবেও) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কিংবা Public Swimming Pool এ প্রবেশাধিকার নেই।

তিউনিসিয়া

তিউনিসিয়ার রাষ্ট্রধান হাবিব বারগুইবা এক আদেশবলে তার দেশে মহিলাদেরকে হিজাব ও স্কার্ফ পরতে নিষেধ করেন।

- সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি, জাতীয় প্রবৃদ্ধি (G.D.P.) কমে যেতে পারে এ আশঙ্কায় সরকারি চাকরিজীবী, শ্রমিক ও উৎপাদনের সাথে জড়িত কাউকে পবিত্র রমজান মাসে ফরজ রোজা রাখতে দেয়া হয় না।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশ

বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর বলবৎ হয়।

সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয় :

'জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।'

৮ নং ধারার ১ নং উপধারায় লেখা হয়

'জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।'

৩৮ নং ধারায় 'সংগঠনের স্বাধীনতা' Sub-Heading এ লেখা হয় :

'জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ, গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে; তবে শর্ত থাকে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোনো ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোনো সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য হইবার বা অন্য কোনো প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকার কোনো ব্যক্তির থাকিবে না।'

১৯৭২ সালের সংবিধান কার্যকর হবার পর বাংলাদেশ একটি সেকুলার রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এ দেশে ইসলামের নামে কোনো রাজনৈতিক দল, কোনো সমিতি, কোনো সংগঠন করা আইনত নিষিদ্ধ হয়। অথচ এ দেশে কমিউনিস্ট পার্টি, জাসদ, বাসদ, ন্যাপ প্রভৃতি কার্লমার্কস, লেনিন, স্টালিন, মাওসেতুং এর আদর্শ বাস্তবায়নকারী দল কাজ করতে থাকে।

তখনকার সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে কুরআনের আয়াত 'রাব্বি জিদনি ইলমা' এবং ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের মনোগ্রাম থেকে 'ইকরা বিইসমি রাব্বিকাললাজি খালাক' মুছে ফেলেন। এভাবে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হল, জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। ঢাকা ইসলামিয়া ইন্টারমিডিয়েট কলেজের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় কবি নজরুল ইসলাম কলেজ। কিন্তু নজরুল ইসলামের 'ইসলাম' তাদের সহ্য হয়নি। কিছুদিন পর 'ইসলাম' বাদ দিয়ে কলেজটির নাম রাখা হয় কবি নজরুল

www.nagorikpathagar.org

কলেজ। এভাবে যেখানে 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' শব্দ পাওয়া গেছে সেখান থেকে এ দুটো শব্দ বাদ দেয়া হয়েছে। এ সময় দেশের শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য ড. কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়- ১ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদেরকে ধর্মীয় শক্ষা প্রদান করা যাবে না। এর উপরের স্তরের কোনো শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলে Optional Subjecct হিসেবে ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

মসজিদ নগরী ঢাকায় সরকারি উদ্যোগে ও পৃষ্ঠপোষকতায় অসংখ্য মূর্তি স্থাপন করা হয়। পাঠ্যপুস্তক থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনী পাঠ উঠিয়ে ফেলা হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর বিলাতের অত্যন্ত নামি পত্রিকা- 'Sundy times' এর ১৭ আগস্ট সংখ্যায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক 'The Legacy of Blood' এর লেখক এন্তনী মাসকারেনহাস একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন :

'... মুজিব পতনের দ্বিতীয় প্রধান কারণ হচ্ছে ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশের সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা থেকে সরিয়ে দেয়া। ইসলামের মর্যাদার এই অবমাননা অনিশ্চয়তাসূচক প্রমাণিত হয়েছে।

'এক হাজার মসজিদের শহর' বলে ঢাকা বরাবর গর্ব করেছে। বাঙালিরা ঐতিহ্যগতভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানিদের চেয়ে বেশি ধর্মানুরাগী। অপরদিকে বাঙালি মুসলমানরা উপমহাদেশে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্রের পরিকল্পনা অবিচলিতভাবে সমর্থন করেছিল বলেই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল।

এই পটভূমিতে মুজিবের অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাংলাদেশের জনগণের বৃহত্তর অংশকে আহত করেছিল।'

শেখ মুজিবের পতনের পর ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসে সংবিধানের সেকুলার চরিত্রের অবসান হয়। সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' সংযোজিত হয় এবং ধর্মনিরপেক্ষতা উঠে যায়। সংবিধানের ৮ নং ধারা পরিবর্তন করা হয় এবং ৩৮ নং ধারা থেকে ধর্মীয় নামযুক্ত কিংবা ধর্মভিত্তিক সংগঠন করার ব্যাপারে যে বাধা-নিষেধ ছিল তা উঠে যায়। জনগণ গণভোটের মাধ্যমে এ পরিবর্তন সমর্থন করে।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশে মাত্র একজন* শতভাগ খাঁটি সেকুলার

আমার জানামতে বাংলাদেশে মাত্র একজন খাঁটি সেকুলার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তার বিশ্বাসে ১০০% মজবুত ছিলেন। তিনি ইহজগতের বাইরে অন্য কোনো জগত সোজা কথায় পরকাল, পুনরুত্থান, শেষ বিচার, বেহেশত, দোযখ এমনকি সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই তিনি জীবিতাবস্থায় বলে গিয়েছিলেন তার যেন জানাযা, দাফন-কাফন না হয় এবং লাশ কবরস্থ না করা হয়। তার দেহাবশেষ যেন মেডিক্যাল কলেজে দিয়ে দেয়া হয়, যাতে মেডিক্যাল ছাত্ররা তার লাশ ও কংকাল ইহজাগতিক কাজ– অর্থাৎ বিদ্যাশিক্ষা অর্জনে ব্যবহার করে। তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. আহমদ শরীফ। তিনি এক অর্থে ধন্যবাদ পাওয়ার উপযুক্ত, কারণ তিনি তার বিশ্বাসে বলিষ্ঠ ছিলেন। তার ভেতর-বাইরে মোনাফিকি ছিল না। তিনি সেকুলারিজম তথা ইহজাগতিকতাবাদে ১০০% নির্ভেজাল বিশ্বাসী ছিলেন। ফলে তার জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ড ইহজগৎকেন্দ্রিক হয়েছে। যেহেতু জানাযা, দাফন-কাফন, লাশ কবরস্থ করা ইত্যাদি ইহজাগতিক কাজ নয়, আখিরাতকেন্দ্রিক কাজ তাই তিনি এগুলো থেকে তার লাশকে মুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন।

যারা তার মতের অনুসারী, সেকুলারিজমে বিশ্বাস করেন, তাদের লাশকেও যেন ইহজগৎকেন্দ্রিক কাজের বাইরে পরজগৎকেন্দ্রিক কোনো কাজকর্মে জড়িত না করা হয়, আহমদ শরীফের মতো, এ রকম সাহসী উচ্চারণ তাদের পক্ষ থেকেও এসে যাওয়া উচিত, যদি তারা সেকুলারিজমে ১০০% নির্ভেজাল বিশ্বাসী হন। যদি তারা জীবিতাবসথায় এ রকম ঘোষণা না করেন, তাহলে বুঝা যাবে তারা সেকুলারিজমের পক্ষে ওকালতি করেন বটে–

* বি. দ্র. বাংলাদেশে ১০০% নির্ভেজাল সেকুলার ব্যক্তি খুব কম থাকলেও এ দেশে বহুলোক আছে– তাদের কেউ ৯০%, কেউ ৭৫%, কেউ ৫০%, কেউ ২৫%, আবার কেউবা ১০% সেকুলার।

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বাসে কিন্তু তারা ১০০% খাঁটি সেকুলার হতে পারেননি। ফলে মৃত্যুর মুহূর্তে তাদের মুখ থেকে ঐ দার্শনিকের মতো কথা উচ্চারিত হয়ে যেতে পারে, যে বলেছিল–

'O God! If there be any, forgive me, if you have the power to forgive.

অর্থাৎ হে খোদা, যদি তুমি থেকে থাক, আমাকে ক্ষমা কর, যদি ক্ষমা করার তুমি ক্ষমতা রাখ।'

আহমদ শরীফের অনুসারী যারা বাংলাদেশকে সেকুলার রাষ্ট্র বানানোর প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের বক্তব্য মোটামোটি এ রকম :

১. ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার– ধর্ম হলো Private relation between man and God.

২. ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার

৩. মানব ধর্ম আসল ধর্ম অন্যান্য ধর্ম সাম্প্রদায়িক

৪. ইসলাম সাম্প্রদায়িক ধর্ম

৫. ইসলাম ধর্ম পবিত্র ধর্ম। পবিত্র ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে আনা উচিত নয়।

১. প্রথমে ধর্মের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা হলো : Private relation between man and God.

অর্থাৎ ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের নাম হলো ধর্ম।

এ সংজ্ঞার বাইরে আরো দুটি সংজ্ঞা আছে। একটি সংজ্ঞা জার্মান দার্শনিক ইহুদি সন্তান Karl Marks দিয়েছেন। এটি হলো Religion is the opium of the people. অর্থাৎ জনগণের নিকট ধর্ম আফিম সদৃশ। অন্য সংজ্ঞাটি প্রদান করেছেন ইহজাগতিকতাবাদী সেকুলার বস্তুবাদী দার্শনিকগণ। তাদের দেয়া সংজ্ঞা হলো– 'ধর্ম মানুষের অলীক কল্পনার ফসল।'

এ তিনটি সংজ্ঞাই ধর্মের সঠিক সংজ্ঞা নয়। ধর্ম মানুষের জন্য এসেছে, কিন্তু কোনো মানুষ ধর্ম সৃষ্টি করেনি। ধর্মের সঠিক সংজ্ঞা অবগত হবার আগে মানুষের জন্য কিভাবে ধর্ম এলো তার ঐতিহাসিক পটভূমি জানা দরকার।

www.nagorikpathagar.org

মহান আল্লাহ মানুষ ব্যতীত মহাবিশ্ব ও অন্যান্য সৃষ্টির কাজ সমাপ্ত করার পর সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি পৃথিবী নামক গ্রহে তাঁর প্রতিনিধি, তাঁর খলিফা প্রেরণ করবেন, যারা তাঁর হয়ে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়ন করবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনি মাটি দিয়ে নিজ হাতে মানুষের সুরত তৈরি করে তাতে রুহ (প্রাণবায়ু) ফুঁকে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম মানুষ 'আদম' সৃষ্টি হয়ে গেলেন। তাকে আল্লাহতায়ালা সব ধরনের জ্ঞান শিক্ষা দিলেন। অতঃপর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ ফেরেশতা ও ইবলিশের সামনে আদমকে পেশ করে তাকে সম্মানসূচক সিজদা করতে আদেশ দিলেন। ফেরেশতারা সেজদা করলেন। কিন্তু আগুনের তৈরি ইবলিশ অহঙ্কার প্রদর্শন করে আল্লাহর আদেশ অমান্য করল। সে সিজদা করা থেকে বিরত থাকল। অধিকন্তু যুক্তিতর্ক (Argument) জুড়ে দিল।

আল্লাহ্ তাকে অপমানিত করে বিতাড়ন করলেন। ইবলিশ আল্লাহর কাছে একটি অনুমতি প্রার্থনা করল। সে বলল– 'যেহেতু মানুষের কারণে আমি অপমানিত হয়ে বিতাড়িত হচ্ছি, অতএব মানুষকে সিরাতুল মুস্তাকিম অর্থাৎ সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য আমি ডান, বাম, সামনে ও পেছন দিক থেকে চেষ্টা করে যাব, আমাকে হাশরের দিন পর্যন্ত তা করার সুযোগ দিন। আমি ইহজগতে মানুষের জন্য এমন আকর্ষণ সৃষ্টি করব, যে আকর্ষণের টানে সে ভুলে যাবে যে, সে আপনার প্রতিনিধি। সে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলে বিভ্রান্ত হয়ে আপনার পরিবর্তে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে। আর আমাকে ও আমার বংশধরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে।'

আল্লাহ ইবলিশকে অনুমতি দিয়ে বললেন– 'যে মানুষ আমার প্রতিনিধিত্ব না করে তোর প্রতিনিধিত্ব করবে, তোকে ও তোর বংশধরকে অভিভাবক বানাবে– তাদেরকে, তোকে ও তোর বংশধরদেরকে দিয়ে দোযখ ভর্তি করে চিরস্থায়ী শাস্তি প্রদান করতে থাকব।'

আল্লাহ্ সাময়িক সময়ের জন্য আদমকে বেহেশতে থাকার অনুমতি দিলেন। তার একাকিত্ব দূর করার এবং আরাম ও প্রশান্তির জন্য তার বাম পাঁজর থেকে তার সঙ্গিনী 'হাওয়া'কে সৃষ্টি করলেন। বেহেশতের সবকিছু তাদেরকে ভোগ করার অধিকার দিলেন। কিন্তু একটি গাছের নিকট যেতে নিষেধ করলেন। তারাও ঐ গাছের নিকট না যাবার সংকল্প করলেন।

এদিকে ইবলিশ যাকে হাশরের দিন পর্যন্ত মানুষকে বিভ্রান্ত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, সে আদম, হাওয়ার হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করালো। আদম, হাওয়া নিজ সংকল্পে অটল থাকতে পারলেন

www.nagorikpathagar.org

না। নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার পর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। আদম ও হাওয়া ভুল বুঝতে পারলেন। তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন– 'হে আমাদের রব, আমরা নিজেদেরর উপর জুলুম করে ফেলেছি, আপনি যদি আমাদেরকে মাফ না করেন, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে যাব।'

আল্লাহ আদম ও হাওয়ার তওবা কবুল করে তাদেরকে মাফ করে দিলেন এবং ইবলিশ যে মানুষের চির দুশমন এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আদম, হাওয়া ও ইবলিশকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন– যেখানে পাঠানোর জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। পাঠানোর সময় তাদেরকে বলে দিলেন :

'দুনিয়াতে তোমাদের বাসস্থান ও জীবিকা রয়েছে। সেখানে নির্দিষ্ট হায়াত পর্যন্ত তোমরা জীবিত থাকবে, অতঃপর মরবে আর সেখান থেকে হাশরের দিন তোমাদের পুনরুত্থান হবে। ইহজগতে থাকাকালীন অবস্থায় আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য হেদায়াত (জীবনযাপন প্রণালী) আসতে থাকবে। যারা এ হেদায়াত মেনে চলবে তাদের ভয় পাবার এবং হতাশ হবার কোনো কারণ নেই। আমি তাদের উপর সন্তুষ্ট হব এবং চিরস্থায়ী বেহেশতে থাকার ব্যবস্থা করে দেব।'

আল্লাহ হযরত আদম (আ.) কে তার ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য প্রথম নবী বানিয়ে পাঠান। তারপর ক্রমাগত বনিআদমের মধ্য থেকে বাছাই করা মানুষকে আল্লাহর নবী ও রসুল মনোনীত করতে থাকেন। তাঁরা বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন এলাকায়, বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর (কওম) জন্য নবী হয়ে আসতে থাকেন। প্রত্যেক নবীর কাছে আল্লাহতায়ালা মানুষের জন্য হেদায়াত পাঠাতে থাকেন। 'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন রাসূল পেরণ করেছি (এ নির্দেশ দিয়ে যে) আল্লাহর বন্দেগি কর; তাগুত থেকে বিরত থাক।' (সূরা : আন নহল, আয়াত-৩৬) নবী রসুলদের সংখ্যা হবে কমপক্ষে একলাখ চব্বিশ হাজার। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) কে সর্বশেষ নবী ও রসুল মনোনীত করা হয়েছে। আল্লাহ পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর পর আর কোনো নবী পাঠাবেন না। মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে প্রেরিত আল্লাহর হেদায়াত সম্বলিত সর্বশেষ আসমানি কিতবের নাম 'আল কুরআন'। আল্লাহ নিজে কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাবের হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। আল কুরআন সকল নবী রসুল ও আসমানি কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী। আল কুরআনে আছে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক দিক– এক কথায় মানুষের সার্বিক দিকের দিকনির্দেশনা।

এ ইতিহাস জানার পর ধর্মের সংজ্ঞা জানার চেষ্টা করি। ধর্মের সঠিক সংজ্ঞা

www.nagorikpathagar.org

হলো– 'প্রত্যেক নবী রাসূলের কাছে আল্লাহর তরফ থেকে ফেরেশতা সর্দার হযরত জিবরাঈল (আ.) এর মাধ্যমে মানুষের জন্য যে হেদায়াত বা জীবনযাপন প্রণালী এসেছে সে হেদায়াতের আরো একটি কুরআনি পরিভাষা হলো 'দ্বীন' যার বাংলা অনুবাদ আমাদের সমাজে প্রচলিত হয়ে গেছে 'ধর্ম' হিসেবে।'

ধর্ম শুধু মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারের সাথে সম্পর্ক নয়, ধর্ম মানুষের জীবনের সার্বিক দিকের সাথে সম্পৃক্ত।

২. ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার অর্থাৎ জনগণের

এ বক্তব্যের দুটি অংশ :

(ক) ধর্ম যার যার

(খ) রাষ্ট্র সবার অর্থাৎ জনগণের।

প্রথমে (খ) অংশের আলোচনা করা হবে, পরে (ক) অংশের আলোচনা হবে।

(খ) অংশের আলোচনা : রাষ্ট্র সবার অর্থাৎ জনগণের

রাষ্ট্র তথা দেশ বলতে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, তার ভূ-গর্ভস্থ সম্পদ, জলজ সম্পদ, ভূপৃষ্ঠস্থ সম্পদ ও ভূ-উপরস্থ সম্পদ এবং সমুদ্রসীমা থাকলে উপকূলস্থ সম্পদ ইত্যাদি বুঝায়। দেশ তথা রাষ্ট্র জনগণের হলে রাষ্ট্রের সম্পদেরও মালিক জনগণ। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমিও রাষ্ট্রের সম্পদের একজন মালিক। হতে পারি পনের কোটি ভাগের এক ভাগের মালিক।

অন্যান্য সম্পদের কথা বাদ দিলাম। খনিজ সম্পদের উপর আমার দাবি উত্থাপন করছি। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে কোটি কোটি টাকার খনিজসম্পদ আহরণ করা হয়েছে। এ সম্পদের কমপক্ষে পনের কোটি ভাগের এক ভাগের মালিক আমি। আমি আমার অংশ আজ পর্যন্ত বুঝে পাইনি। খনিজসম্পদের টাকা যাদের কর্তৃত্বে আছে তারা ভবিষ্যতে আমাকে আমার অংশ বুঝিয়ে দেবেন এমন আলামত দেখছি না। যদি আমি আমার অংশের জন্য মামলা করি এবং শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে যাই, সে কোর্টও আমার অংশ বুঝিয়ে দেবে– এমন সম্ভাবনা দেখছি না। কারণ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণও তাদের অংশ বুঝে পাননি।

অবস্থা যদি তাই হয় তাহলে আমি সম্পদের মালিক হলাম কিভাবে? কোন যুক্তিতে? তাহলে জনগণ দেশ ও রাষ্ট্রের সম্পদের মালিক হলো কোন দলিলের ভিত্তিতে? কোন নৈতিক অধিকারে? বাস্তবেই যদি জনগণ মালিক হতো তাহলে

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যেকে তার অংশ অবশ্যই বুঝে পেত।

প্রকৃত সত্য হলো– দেশ ও দেশের খনিজ, বনজ, জলজ ইত্যাদি কোনো সম্পদের মালিক জনগণ নয়। দেশের একখণ্ড মাটি, মাটির গুণাগুণ, একটি মাছ, একটি গাছ, একটি পশু, একটি পাখি, বাতাসের সামান্য অক্সিজেন, একটি বৃষ্টির ফোঁটা, নদী-নালার পানি ইত্যাদি কোনো কিছু মানুষ সৃষ্টি করেনি। এসব কিছুর স্রষ্টা হলেন মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তিনিই সব কিছুর মালিক। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। 'লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওমা ফিল আরদ।'

'আকাশরাজ্য ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর।' (সূরা : বাকারা, আয়াত ২৮৪)

আকাশ রাজ্য ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তিনিই মালিক সেসব জিনিসের যা আসমান ও জমিনের আছে। আর যা আছে আসমান ও জমিনের মাঝখানে এবং মাটির গর্ভে। (সূরা : ত্বাহা, আয়াত ৬)

'বল প্রতিটি জিনিসের সৃষ্টিকর্তা কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তিনি একক, তিনি সর্বজয়ী। (সূরা : রা'দ, আয়াত ১৬)।

আল্লাহ মানবজাতিকে তাঁর খলিফা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। 'ইন্নি জা-ঈ-লুন ফিল আরদি খলিফা।' তিনি মানুষের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। 'তিনিই সে সত্তা যিনি হে মানুষ তোমাদের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন'। (সূরা : বাকারা, আয়াত ২৯)।

সুতরাং জনগণ সবকিছুর মালিক নয়। তবে মানুষ হোক সে হিন্দু বা মুসলমান, বৌদ্ধ কিংবা খ্রিস্টান, সাদা বা কালো, নারী কিংবা পুরুষ সবই আল্লাহর খলিফা, তাঁর প্রতিনিধি এবং সবকিছুর ভোগাধিকারী। সবকিছু মানুষের খেদমত করবে, মানুষ সবকিছু ভোগ করবে যেহেতু সে সৃষ্টিরকর্তার খলিফা, তাঁর প্রতিনিধি। আর মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর মালিকানাধীন সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছামতো ব্যবহার করবে। সে যেহেতু কোনো কিছুর মালিক নয়, কোনো কিছু তার মালিকানাধীন নয় সুতরাং তার নিজের position, নিজের মর্যাদা নিজেকে উপলব্ধি করতে হবে। সে মালিকের ইচ্ছার বাইরে নিজের ইচ্ছা বা আইন প্রয়োগ করে কোনো কিছু করলে সে হবে স্বেচ্ছাচারী, মালিককে অস্বীকারকারী, আমানতের খেয়ানতকারী, জুলুমবাজ, অকৃতজ্ঞ ও নিমক হারাম।

মানুষকে অনুভব করতে হবে 'আমি সৃষ্টির সেরা, সবকিছু আমার জন্য সৃষ্টি করা

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে। আমার মর্যাদা সবার উপরে কারণ সৃষ্টিকর্তা আমাকে তাঁর নিজের প্রতিনিধির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে সবকিছুর উপর তার ইচ্ছা কার্যকর করার দায়িত্ব প্রদান করেছেন। ঐ উপলব্ধি যার মধ্যে আসবে সে মর্যাদার উচ্চ আসনে সমাসীন হতে পারবে, হতে পারবে আমানতের হেফাজতকারী, স্বীয় কর্তব্য সঠিকভাবে পালনকারী, সত্যের সাধক, সফলকাম ব্যক্তি, সত্যিকার কল্যাণকামী, বিশ্বস্ত ও কৃতজ্ঞ।'

অতএব দেশ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ব্যক্তি– হোন তিনি কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, সংস্থা প্রধান, সমাজ প্রধান, সরকার কিংবা রাষ্ট্রপ্রধান তাকে এ অনুভূতি নিয়ে কাজ করতে হবে– 'আমি সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি।' আমাকে সৃষ্টিকর্তা বিরাট সুযোগ প্রদান করেছেন, আমার উপর কর্তব্যের বোঝা বিরাট। আমাকে স্বেচ্ছাচারী হলে চলবে না, আমানতের খেয়ানত করা যাবে না।

মালিককে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে আমাকে সব কাজ সম্পাদন করতে হবে। সর্বপ্রকার নিয়ামত যা আমি ভোগ করছি, সে নিয়ামতের জন্য কাল আদালতে আখিরাতে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হবে।

(ক) অংশের আলোচনা : ধর্ম যার যার

এ কথা দ্বারা Secular ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা বুঝাতে চাচ্ছে– যারা ধর্ম পালন করতে চায়, তারা ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম পালন করুক তাতে কোনো আপত্তি নেই। তবে রাষ্ট্রে যেহেতু হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবার বসবাস (আমাদের দেশের জন্য প্রযোজ্য) সুতরাং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারসমূহে যারা Secular, যারা ধর্মনিরপেক্ষবাদী, তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। তারা তাদের ইচ্ছা ও খেয়াল-খুশিমতো আইন প্রণয়ন করে সরকার চালাবে। ধার্মিক লোকেরা ব্যক্তিগত গণ্ডির সীমারেখার মধ্যে ধর্ম পালন করবে, এর বাইরে ধর্মের কোনো অবস্থান থাকবে না। এর অর্থ দাঁড়ায় তারা অতি চালাকি করে ধার্মিক লোকদের বোকা বানিয়ে, তাদেরকে বঞ্চিত করে, রাষ্ট্রীয় দায়-দায়িত্ব ও সরকারি কর্মকাণ্ড পরিপূর্ণভাবে তাদের কব্জায় নিয়ে নিতে চায়। 'ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার' এ বাক্যের একটি দৃষ্টিভঙ্গি উপরে আলোচিত হলো।

এর অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখা যাক :

'ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার'– এর পরিপূরক কথা হলো– 'ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সব ধর্মের লোকদের।'

www.nagorikpathagar.org

আমাদের দেশের জন্য প্রযোজ্য হবে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টানসহ সকলের।

যেহেতু আমাদের দেশের সব ধর্মের নাগরিকবৃন্দ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে নিজ নিজ ধর্ম পালন করে থাকেন– অতএব রাষ্ট্র সকল ধর্মের পক্ষে অবস্থান নেবে, সকল ধর্মকে স্বীকৃতি দেবে, সকল ধর্মাবলম্বীদেরকে সম্মান করবে।

বর্তমানে আমাদের দেশের আদালত ও রাষ্ট্র প্রত্যেক ধর্মের লোকদের স্ব-স্ব ধর্মের পারিবারিক আইনের স্বীকৃতি দেয় এবং আদালতের এ সংক্রান্ত রায় সরকারের শাসনবিভাগ কার্যকর করে থাকে। ধর্মীয় আইন-কানুন কেবলমাত্র পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক, বিচার ফয়সালা ইত্যাদি বিষয়সমূহেও ধর্মীয় আইনের অস্তিত্ব বিদ্যমান। ধর্মের অন্যকথায় সৃষ্টিকর্তার 'কিছু আইন মানা যাবে, আর কিছু আইন মানা যাবে না'– এর কি কোনো যৌক্তিকতা আছে? সব ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্র যেহেতু সকল ধর্মকে স্বীকৃতি দেয়, অতএব রাষ্ট্রের পক্ষে সব ধর্মের সকল আইন-কানুনের স্বীকৃতি দিতে আপত্তি কোথায়?

হ্যাঁ– হিন্দু ধর্মীয় আইন-কানুন কেবলমাত্র হিন্দুদের উপর প্রযোজ্য হবে। তেমনি ইসলামী আইন-কানুন শুধুমাত্র মুসলমানদের উপর প্রযোজ্য হবে, অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীদের উপর প্রয়োগ হবে না। একই কথা বৌদ্ধ-খ্রিস্টানদের উপর প্রযোজ্য। এ মূলনীতির উপর হিন্দু-মুসলিম বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সকল সম্প্রদায়ের সমজদার, নিঃস্বার্থ, ধার্মিক ব্যক্তিবর্গ সম্পূর্ণ একমত।

অতএব 'ধর্ম যার যার'– তারা তাদের নিজেদের ধর্মের সকল আইন-কানুন, বিধি-বিধান মানবে এবং মানার ব্যাপারে আদালত ও রাষ্ট্র আইনানুগ ভূমিকা পালন করবে। উপরোক্ত বক্তব্য অযৌক্তিক, অনৈতিক unnatural, প্রগতিবিরোধী, সাম্প্রদায়িক, ধর্মান্ধ কিংবা মানবতাবিরোধী কোনো বয়ান নয়।

রাষ্ট্র পরিচালনা করে সরকার। সরকারে সব ধর্মের লোক থাকবে। পার্লামেন্টে সব ধর্মের লোক নির্বাচিত হবে। এর জন্য আদর্শস্থানীয় Ideal নির্বাচন ব্যবস্থা হলো পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি– Separate Electorate System. রাষ্ট্র হবে জনকল্যাণমূলক– Welfare State. সরকার ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, অঞ্চল নির্বিশেষে সকল নাগরিকের কল্যাণ নিশ্চিত করবে। উল্লেখ্য যে, সকল ধর্মের লোকজন বিশ্বাস করে– 'ইহকালীন জীবনই একমাত্র জীবন নয়– জীবনের ব্যাপ্তি পরকাল পর্যন্ত বিস্তৃত'। অতএব সকল নাগরিকের ইহ ও পরকালীন উভয় জীবনের কল্যাণ সাধনে সরকারকে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। হিন্দুদেরকে আরো ভালো হিন্দু, মুসলমানদেরকে আরো ভালো মুসলমান, বৌদ্ধদেরকে আরো ভালো বৌদ্ধ,

www.nagorikpathagar.org

খ্রিস্টানদেরকে আরো ভালো খ্রিস্টান বানানোর লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। মনে রাখতে হবে ধার্মিক নাগরিকবৃন্দ রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ। তারা আইনের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল। তারা দেশপ্রেমিক ও রাষ্ট্রের খুবই হিতাকাঙ্ক্ষী।

রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান 'আইনসভা' সৃষ্টিকর্তার আইনের স্বীকৃতি দেবে। যেসব ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তার বিধিবিধান নেই, সেসব ক্ষেত্রে আইন ও বিধি-বিধান রচনা করবে। আইন প্রণয়নকালে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে রচিত কোনো আইন-কানুন বা বিধি-বিধান আল্লাহর আইনের পরিপন্থী না হয়।

ইতিহাসের শিক্ষা বড় শিক্ষা। মানব ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়ে শেষ নবী মানবতার মহানায়ক হযরত মুহাম্মদ (সা.) ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনা রাষ্ট্রে ৪৭ ধারাবিশিষ্ট 'মদিনা সনদ' রচনা করেন। 'মদিনা সনদই' মানবজাতির রাজনৈতিক ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান– Written Constitution. মদিনা রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক ইহুদিদের নেতৃবৃন্দ এ সনদে স্বাক্ষর করেন।

এ রাষ্ট্রের কর্ণধার হযরত মুহাম্মদ (সা.) মুসলমানদের উপর ইসলামী আইন-কানুন ও বিধি-বিধান জারি করেন। ইহুদিদের উপর এ আইন-কানুন জারি করা হয়নি। অন্যদিকে ইহুদিদের উপর তাদের ধর্মীয় আইন-কানুন জারি করার জন্য তাদের নেতৃবৃন্দের উপর দায়িত্ব প্রদান করা হয়। মদিনা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ছিল না। মদিনা ছিল ধর্মের পক্ষের রাষ্ট্র। মদিনা রাষ্ট্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি প্রদান করা হয় এবং ধর্ম বর্ণ, ভাষা, গোত্র, অঞ্চল নির্বিশেষে সকল মানুষ 'আল্লাহর খলিফা' এ মর্যাদায় মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে নির্দ্বিধায় এ উপসংহার টানা যায় যে, 'ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার' বাক্যটি সেকুলারিজমের পক্ষে কোনো যুক্তি নয়। তবে বাক্যটি 'ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার' পরিবর্তে 'ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সব ধর্মের লোকদের' বলাই উত্তম ও যুক্তিযুক্ত।

৩. মানব ধর্ম আসল ধর্ম অন্যান্য ধর্ম সাম্প্রদায়িক

উপরোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলা যায় :

মানব ধর্ম যদি আসল ধর্ম হয় তবে অনুসন্ধান করে জানতে হবে এ ধর্মের উপাদান কী কী?

সবাই জানে ধর্মের অত্যাবশ্যক উপাদন হলো– স্রষ্টা, সৃষ্টি, নবী-রসুল, ধর্মগ্রন্থ,

www.nagorikpathagar.org

পুনরুত্থান, শেষ বিচার, স্বর্গ, নরক, পূজা-উপাসনা-ইবাদত, পূজারি, যার উদ্দেশ্যে পূজা প্রদান করা হয় (মাবুদ) ইত্যাদি। মানবধর্মে এ সমস্ত উপাদান আছে কি?

যদি না থাকে তবে এটা ধর্ম পদবাচ্য হলো কবে? কার মাধ্যমে? কিভাবে?

বলা হয় মানবধর্মের রচয়িতা মানুষ। সবাই জানে মানুষ যা রচনা করে তা মতবাদ (ism) হয়, ধর্ম হয় না। তারপরও যদি জোর খাটিয়ে বলা হয় মানবধর্ম আসল ধর্ম তাহলে কিছু প্রশ্নের সৃষ্টি হয় যার জবাব পাওয়া দরকার।

মানবধর্মের রচয়িতা– কোন মানুষ?

কোন শ্রেণীর মানুষ?

কোন দেশের মানুষ?

কোন কালের মানুষ?

কোন বর্ণের মানুষ?

যিনি এ ধর্ম রচনা করেছেন– তিনি কি সবজান্তা?

তিনি কি ভুলের উর্ধ্বে?

তিনি কি স্বার্থের উর্ধ্বে?

তিনি কি কালের উর্ধ্বে?

কবে এ ধর্মের আবির্ভাব হলো? কাদের উপর এ ধর্ম প্রযোজ্য হবে?

মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনযাপনের প্রয়োজনে বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ ধর্মে মানুষের সব সমস্যার সমাধান আছে কি?

এ ধর্মে চিরসত্য বলে কিছু আছে? না সত্য আপেক্ষিক?

এ ধর্ম আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে, না নিশ্চিত কোনো জ্ঞানের সাহায্যে রচিত হয়েছে? যদি নিশ্চিত কোনো জ্ঞানের সাহায্যে রচিত হয়ে থাকে তবে সে জ্ঞানের উৎস কী? মানবধর্মে মানবের পরিসমাপ্তি ইহজগতে শেষ? না আর কোনো জগত আছে?

মানবধর্ম রচয়িতাকে যদি প্রশ্ন করা হয়– 'আপনিও মানুষ, আমিও মানুষ, তাহলে আপনি কোন অধিকারবলে আপনার রচিত ধর্ম আমার উপর চাপিয়ে দিতে চান?' এর জবাব কী হবে?

এ সমস্ত জবাব পাওয়ার পরই কেবল মানবধর্ম বিবেচনার যোগ্য হতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

৪. ইসলাম সাম্প্রদায়িক ধর্ম

ইসলাম ধর্মের উপর সেকুলাররা অভিযোগ উত্থাপন করে যে, ইসলাম একটি সাম্প্রদায়িক ধর্ম।

সেকুলারদের এ অভিযোগ সঠিক নয় কারণ :

ইসলাম কোনো মানুষের রচিত ধর্ম নয়। এ ধর্ম সমগ্র বিশ্বজগৎ ও সৃষ্টিকূলের স্রষ্টা মহান আল্লাহতায়ালা নাজিল করেছেন। এ ধর্মের পরিবর্তন, পরবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন করার অধিকার কোনো মানুষের নেই। ইহজগতের সর্বস্বীকৃত শ্রেষ্ঠতম মানুষ, সর্বশেষ নবী ও রসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) যার উপর আসমানি কিতাব আল কুরআন নাজিল হয়েছে– তাঁর নিজেরও ধর্মে কোনোকিছু সংযোজন কিংবা বিয়োজন করার কোনো অধিকার ছিল না।

মহান আল্লাহতায়ালা বলেন– 'এই নবী যদি কোনো কথা রচনা করে আমার নামে চালিয়ে দিত, তাহলে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠশিরা ছিন্ন করে ফেলতাম। (সূরা : হাক্কাহ, আয়াত ৪৪, ৪৫ ও ৪৬)

আল্লাহ মানুষের সৃষ্টিকর্তা। মানুষ আল্লাহর খলিফা তথা প্রতিনিধি। সৃষ্টির প্রতি তাঁর কোনো বৈষম্য নেই। তাঁর সৃষ্ট বাতাস, পানি, মাটি, আগুন, সূর্যের আলো, চাঁদের জোসনা, বৃষ্টির পানি, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফল-ফসল, গাছ, মাছ, পশু-পাখি ইত্যাদি কোনো সম্প্রদায় বিশেষের জন্য নয়, কোনো কালের জন্য নয়, কোনো এলাকার জন্য নয়, এগুলো সর্বকালের, সব এলাকার, সব মানুষের জন্য।

অতএব আল্লাহর প্রেরিত ধর্ম ইসলাম কোনো সম্প্রদায়ের জন্য নয়, কোনো কালের জন্য নয়, নয় কোনো বিশেষ এলাকার জন্য। আল কুরআনে মানুষকে আহ্বান করা হয়েছে এ ভাষায়– ইয়া আইয়ুহান নাস– হে মানবমণ্ডলী।

সুতরাং ইসলামকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম বলা অযৌক্তিক ও অসঙ্গত।

৫. ইসলাম পবিত্র ধর্ম, পবিত্র ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে আনা উচিত নয়। উপরোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ৩টি কথা

প্রথমত : নীতিগতভাবে একটি কথা বলতে হয়। রাজনীতি যারা করেন, তারা জনগণের মন জয় করে তাদের ভোটে নির্বাচিত হতে চান। নির্বাচনের সময় একটি শ্লোগান সর্বত্র শোনা যায়। শ্লোগানটি হলো– 'অমুক ভাইর চরিত্র ফুলের

www.nagorikpathagar.org

মতো পবিত্র।' সুতরাং যারা ফুলের মতো পবিত্র, তারাই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং বিজয়ী হয়ে জনগণের খেদমত করতে চান। মানুষের খেদমত করা হক্কুল ইবাদ- সৃষ্টির সেবা অত্যন্ত পবিত্র কাজ। যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন, তারাই রাজনীতি করেন, তারাই সৃষ্টির সেরা মানুষ তথা দেশ ও দশের খেদমত করতে চান। তাদের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও নিয়ত পবিত্র আর তাদের চরিত্রও ফুলের মতো পবিত্র। অতএব তারা রাজনীতিকে অপরিচ্ছন্ন করবেন না। রাজনীতিকে পবিত্র রাখবেন- এটাই সর্বসাধারণের কাম্য।

দ্বিতীয়ত

উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে পবিত্র বলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। পবিত্র ধর্মের অঙ্গচ্ছেদ করলে ধর্মকে প্রতিবন্ধী বানিয়ে ফেলা হবে। সুতরাং সবার খেয়াল রাখা দরকার, পবিত্র ধর্মের অঙ্গহানি যেন না হয়।

তৃতীয়ত

আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রদান করে সৃষ্টি করেছেন। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসহ মানুষের সম্পূর্ণ সত্তাকে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করার নামই ইসলাম।

মানুষের কাছে আল্লাহর প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হলো ইসলাম। ইসলাম মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার নাম। এখানে জীবনের এমন কোনো দিক নেই, যেদিক বাদ পড়েছে।

আল্লাহ নিজেই বলেন- 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে (ধর্ম) পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। আর আমার নিয়ামত পূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের জীবনবিধান হিসেবে কবুল করলাম।'

(সূরা : মায়েদা, আয়াত ৩)

অতঃপর আল্লাহর তরফ থেকে মানুষের জন্য হুকুম এলো- 'তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে দাখিল হও। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না।' (সূরা : বাকারা, আয়াত ২০৮) তারপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সাবধানবাণী এলো- 'তোমরা কি (আল্লাহর) কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর, আর কিছু অংশ কর অবিশ্বাস। জেনে রাখো- তোমাদের মধ্যে যারা এমন আচরণ করবে, তাদের এতদব্যতীত আর কি শাস্তি হতে পারে যে, তারা দুনিয়ার জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠোরতম আজাবের দিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমাদের কাজকর্মের ব্যাপারে আল্লাহ মোটেই বেখবর নন।' (সূরা : বাকারা,

www.nagorikpathagar.org

আয়াত ৮৫)

'হে নবী, আপনি কি ঐসব লোকদের দেখেননি, যারা দাবি করে তারা ঈমান এনেছে আপনার উপর নাজিল করা কিতাবের উপর এবং ঐসব কিতাবের উপর, যা আপনার পূর্বে নাজিল করা হয়েছিল। কিন্তু তারা তাদের যাবতীয় ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্য তাগুতের * কাছে যেতে চায়। আর তাগুতকে অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে সঠিক পথ থেকে বহুদূরে নিয়ে যেতে চায়।'

(সূরা : আন নিসা, আয়াত ৬০)

বি. দ্র. তাগুত মানে আল্লাহ বিদ্রোহী শক্তি। তাগুত কাফির থেকে মারাত্মক। কেননা কাফির আল্লাহকে অস্বীকার করে। কিন্তু তাগুত জনগণকে আল্লাহর আনুগত্য করতে বাধা দেয়। শুধু তাই নয়, আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে তার আনুগত্য করতে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাধ্য করে। তাগুত আল্লাহর কালাম আল কুরআনকে সর্বোচ্চ সনদ হিসেবে মানতে অস্বীকার করে এবং মানবরচিত আইনের মাধ্যমে বিচার ফয়সালা করে।

পবিত্র ধর্ম যার কাছ থেকে নাজিল হয়েছে, সে মহান আল্লাহর নির্দেশ শোনার পর আমার প্রতিক্রিয়া হলো :

পবিত্র ধর্মে সম্পূর্ণরূপে দাখিল হতে হবে। 'ধর্মের এক অংশ মানব আর অন্য অংশ মানব না'– এ রকম করা যাবে না। যদি আমি কুরআনের একটি আদেশ– তথা আল্লাহর একটি নির্দেশ অস্বীকার করি, তাহলে আমি কাফির হয়ে যাব। কিন্তু যদি স্বীকার করি কিন্তু বাস্তবায়ন করতে গাফলতি করি তাহলে হব মুনাফিক। মুনাফিকের অবস্থান জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে (সূরা : নিসা, আয়াত- ১৪৫)। এছাড়া দুনিয়ার জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকব এবং পরকালে কঠিন আজাবের সম্মুখীন হব। সুতরাং ধর্মকে পবিত্র বলে গ্রহণ করার পর যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে। ধর্মকে তার নিজস্ব স্থান থেকে টেনে নিচে নামানো যাবে না। বরং আমি যদি পবিত্র ধর্ম ইসলামের কোনো দিক ও বিভাগের বাইরে অবস্থান করি, কিংবা আমার কোনো কার্যকলাপ ধর্মের আওতাবহির্ভূত হয়, তাহলে আমার সম্পূর্ণ সত্তা ও কর্মকাণ্ডকে টেনে এনে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করাতে হবে। অন্যথায় আমার কী পরিণতি হবে তা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ কালামে পাকে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের যত দিক ও

www.nagorikpathagar.org

বিভাগ আছে, রাজনৈতিক দিকসহ সর্বব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সব নির্দেশের গুরুত্ব সমান। কোনো আদেশ অমান্য করার কোনো সুযোগ নেই।

সুতরাং কোনো মানুষ কিংবা মানব সমষ্টির কথায় পবিত্র ধর্ম ইসলামের কোনো অংশ রহিত করার কিংবা মুলতবি রাখার এখতিয়ার কোনো মানুষের নেই। যিনি মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, যার উপর কুরআন নাজিল হয়েছে তাঁকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন– 'হে মুহাম্মদ তাদেরকে বল, আমার এ কাজ নয় যে, আমার নিজের তরফ থেকে উহাতে (ধর্মে) কোনোরূপ রদবদল করে নেব। আমি তো শুধু সে ওহির অনুসারী, যা আমার নিকট পাঠানো হয়। আমি যদি আমার রবের নাফরমানি করি, তাহলে আমার এক অতি বড় বিভীষিকাময় দিনের ভয় আছে।' (সূরা : ইউনুস, আয়াত ১৫)

পবিত্র ধর্ম ইসলাম কিভাবে মানতে হবে তার নমুনা ছিলেন আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তার ব্যাপারে আল্লাহর সার্টিফিকেট– 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রসুলের জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।'

(সূরা : আহযাব, আয়াত ২১)

'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তিনি বিরত রাখেন তা থেকে বিরত থাক। আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।' (সূরা : হাশর, আয়াত ৭)

'যে রাসূলের আনুগত্য করে, সে মূলত আল্লাহরই আনুগত্য করে।'

(সূরা : আন নিসা, আয়াত ৮০)

সেই আল্লাহর রসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন মদিনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান। তিনিই সমগ্র দুনিয়ার প্রথম লিখিত সংবিধান ৪৭ ধারাবিশিষ্ট মদিনা সনদ ৬২২ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেছিলেন। তাঁর শাসিত মদিনা রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিক ইহুদিরাও বসবাস করত।

আমাদের দেশে জনগণের একটি অংশ এমন আছেন যারা সঠিক পদ্ধতিতে নিষ্ঠার সাথে নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, হজ্জ করেন, সম্পত্তির বার্ষিক আয়ের সঠিক হিসাব করে গুনে গুনে জাকাত আদায় করেন। তাদের ব্যক্তিগত আমল, আখলাকও ভালো। তারা আল্লাহর রাসূল হযরত মুহম্মদ (সা.) এর প্রতি মহব্বত রাখেন। রাসূল (সা.) এর প্রতি কেউ কোনো কটাক্ষ করলে তারা ক্ষেপে যান এবং কটাক্ষকারীকে শায়েস্তা করার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলেন।

আবার তারা ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি-অর্থনীতি, বিচার-ফয়সালা, শিক্ষাব্যবস্থা

www.nagorikpathagar.org

প্রণয়ন ও শিক্ষাদান ইত্যাদি সামাজিক ও সামষ্টিক বিষয়ে রাসূল (সা.) এর আদর্শ কী তা জানার ও মানার চেষ্টা করেন না। অনেকে সামাজিক, সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সেকুলারিজম তথা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ কায়েম করা কিংবা কায়েম রাখার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। তাদের কেউ এমন মন্তব্য করেন যে, রাসূল (সা.) এর যুগের জন্য তাঁর আদর্শ সঠিক ছিল। এখন যুগ বদল হয়েছে, এ যুগের জন্য ঐ আদর্শ এখন অচল। আবার কেউ মন্তব্য করেন বর্তমানে ঐ আদর্শ ফিরিয়ে আনার অর্থ ঘড়ির কাঁটা উল্টো দিকে ঘুরানো– অর্থাৎ মধ্যযুগ ফিরিয়ে আনা। এ প্রচেষ্টা প্রগতিবিরোধী। আবার কেউ কেউ নেক নিয়তে বলেন– 'রাসূল (সা.) এর হাতে গড়া সাহাবায়ে কেরামের মতো সোনার মানুষ আর আসবে না– সুতরাং যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে, যুগের চাহিদা মিটাতে হবে।'

এ সবার কথার অর্থ দাঁড়ায়– 'রাসূল (সা.) এর আদর্শ আধুনিক যুগে অচল। রাসূল (সা.) এর আদর্শ বিশেষ যুগে বিশেষকালের জন্য এসেছিল। তাঁর আদর্শ ও আল-কুরআনের আইনকানুন সার্বজনীন নয়, সবযুগের জন্য নয়, সর্বকালের সব মানুষের জন্য নয়।' নাউজুবিল্লাহ। রাসূল (সা.) আল কুরআন ও ইসলামের প্রতি এ রকম দোষারোপ করা ঈমানের পরিপন্থী।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন

রাসূল (সা.) রাহমাতুল্লিল আলামিন

কুরআনের আইন-কানুন সার্বজনীন।

রাসূল (সা.) এর রেসালাত কিয়ামত পর্যন্ত, কেননা তিনি শেষ নবী। কিয়ামত পর্যন্ত, আর কোনো নবী আসবেন না– আর কোনো আসমানি কিতাবও আসবে না। তাঁর আদর্শ কালোত্তীর্ণ।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিছক কোনো ব্যক্তি নন। তিনি আখেরি নবী ও আল্লাহর রাসূল। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা– 'রাসূল দ্বীন সম্পর্কে নিজে নিজে কিছু বলেন না। তিনি যা বলেন, ওহি পেয়েই বলেন।'

(সূরা : নযম, আয়াত-৩৩৮)

তিনি নিজের ইচ্ছায় কিছু করেন না। আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু করেন। তাই রাসূল (সা.) যা বলেন, যা করেন এবং যা করার অনুমতি প্রদান করে সবই সুন্নাহ-দলিল। 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।' (সূরা : আহযাব, আয়াত-২৯)

সেই আল্লাহর রাসূল (সা.) নামাজ কিভাবে পড়তে হবে, রোজা কিভাবে রাখতে

www.nagorikpathagar.org

হবে, কিভাবে হজ্জ করতে হবে, কিভাবে জাকাত আদায় করতে হবে– তা দেখিয়ে দিয়েছেন। একই সাথে তিনি কিভাবে পরিবার পরিচালনা করতে হবে, কিভাবে প্রতিবেশীর হক আদায় করতে হবে, তাও শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি ব্যবসা পরিচালনা করেছেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়মনীতি শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শ্রমিকের ঘাম শুকাবার আগে মজুরি প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি চল্লিশ দিনের বেশি খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রাখতে নিষেধ করেছেন। তিনি বিচারক ছিলেন। আবার বিচারের রায় কার্যকর করার ব্যবস্থা করতেন। তিনি উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি এতিমের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি নারীর সঠিক সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছেন। তিনি মদিনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। তিনি দুনিয়ার ইতিহাসে সর্বপ্রথম ৬২২ খ্রিস্টাব্দে লিখিত সংবিধান রচনা করেন যা মদিনা সনদ হিসেবে পরিচিত। তাঁর সময় তাঁর পরিচালনাধীন রাষ্ট্রের সাথে বিরুদ্ধ শক্তির সাতাশটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর মধ্যে রাসূল (সা.) স্বয়ং নয়টি যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি (commander-in-chief) হিসেবে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তিনি বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে পত্র যোগাযোগ করেছেন। তার চিঠিতে official seal (মোহর অংকিত) থাকত। তিনি রাষ্ট্রদূতদের সাথে নিয়মিত সাক্ষাৎ প্রদান করতেন। তিনি প্রতিপক্ষের সথে সন্ধি করেছেন এবং প্রতিপক্ষ সন্ধিভঙ্গ করার আগে সন্ধির কোন শর্ত ভঙ্গ করেননি। তিনি সমাজে প্রচলিত সুদ নিষিদ্ধ করেছেন এবং সমাজ থেকে মদ উৎখাত করেছেন। তিনি মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে আজাদ করেছেন। তিনি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন সত্য চিরসত্য, সত্য আপেক্ষিক নয়।

এসব তিনি করেছেন ব্যক্তি মুহাম্মদ হিসেবে নয়– মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ– আল্লাহর রাসূল হিসেবে। তিনি মসজিদে ইমামতি করার সময় যেমন আল্লাহর রাসূল ছিলেন উপরে বর্ণিত এবং বর্ণনার বাইরে সামষ্টিক সব কাজ পরিচালনার সময়ও তিনি আল্লাহর রাসূল ছিলেন। সুতরাং রাসূল (সা.) এর গোটা জীবনটাই ইসলামী জীবন এবং আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে শামিল। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) হিসেবে রাসূলের সব কথা, কাজ ও অনুমোদন সকল মুসলমানের অবশ্য পালনীয়। এ ব্যাপারে যে ব্যর্থতার পরিচয় দেবে, সে রেসালাতের প্রতি ঈমানদার হতে পারল না।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপস্থাপিত আদর্শ ব্যতীত অন্য কোনো আদর্শ, কোনো মতবাদ অনুসরণ করা রাসূলের অনুসারী 'উম্মার' কোনো সুযোগ নেই।

মুসলমান হতে হলে কিংবা থাকতে হলে ন্যূনতম তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে :

www.nagorikpathagar.org

১. আল্লাহকে এক অদ্বিতীয় ইলাহ হিসেবে মানতে হবে। আল্লাহর কালাম আল কুরআনের প্রতিটি কথার উপর আস্থা স্থাপন করতে হবে।

২. হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে শেষ নবী, তাঁর কথা, কাজ ও অনুমোদনকে দলিল এবং তাঁর নবুওয়তের জীবনকে অনুকরণীয় একমাত্র আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

৩. আখিরাতের উপর ঈমান আনতে হবে।

অতএব একজন দ্বীনদার, ঈমানদার, রেসালতে বিশ্বাসী নবীপ্রেমিকে উম্মতে মোহাম্মদীর পক্ষে সেকুলারিজম তথা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ, তথা ধর্মহীন মতবাদ তথা ইহজাগতিকতাবাদ– যা সম্পূর্ণ মানবরচিত একটি পাশ্চাত্য মতবাদ– অনুসরণ করা সম্ভব নয়।

যারা মনে করেন রাসূল (সা.) এর হাতে গড়া সাহাবায়ে কেরামের মতো সোনার মানুষ আর সৃষ্টি হবে না, ফলে পৃথিবীতে আর দ্বীন কায়েম হবে না, তাদেরকে রাসূলুল্লাহর একটি হাদিস স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে :

'তোমাদের দ্বীনের আরম্ভ নবুওয়ত ও রহমতের মাধ্যমে এবং তা তোমাদের মধ্যে থাকবে– যতক্ষণ আল্লাহ চান। অতঃপর আল্লাহ তাও উঠিয়ে নেবেন। তারপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত পরিচালিত হবে যতদিন আল্লাহ চান। অতঃপর আল্লাহ তাও উঠিয়ে নেবেন।

তারপর শুরু হবে দুষ্ট রাজতন্ত্রের জামানা এবং যতদিন আল্লাহ চাইবেন, তা প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তারপর আল্লাহ তাও উঠিয়ে নেবেন। অতঃপর জুলুমতন্ত্র শুরু হবে এবং তাও আল্লাহ যতদিন চাইবেন, ততোদিন থাকবে, অতঃপর আল্লাহ তাও উঠিয়ে নেবেন।

অতঃপর আবার নবুওয়তের পদ্ধতিতে (খেলাফত আ'লা মিনহাজুন নবুওয়ত) প্রতিষ্ঠিত হবে। নবীর সুন্নত অনুযায়ী তা মানুষের মধ্যে কাজ করে যাবে এবং ইসলাম পৃথিবীতে তার কদম শক্তিশালী করবে। সে সরকারের উপর আকাশবাসী ও দুনিয়াবাসী সবাই খুশি থাকবে। আকাশ মুক্ত হৃদয়ে তার বরকত বর্ষণ করবে এবং পৃথিবী তার পেট থেকে সমস্ত গুপ্ত সম্পদ উদগিরণ করে দেবে।

[এ হাদিসটি মুসনাদে আহমদ হাদিস গ্রন্থে উল্লেখ আছে। এছাড়া ইমাম শাতবী (র.) তাঁর 'আল মাওয়াফিকাত' কিতাবে, মাওলানা ইসমাইল শহীদ (র.) তার 'মানসাবে ইমামত' গ্রন্থে এবং মুহতারাম নাসিরউদ্দিন আলবানী তাঁর সহীহ হাদিস সিরিজ প্রথম খণ্ডে উদ্ধৃত করেছেন।]

www.nagorikpathagar.org

রাসূল (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী কোনো গাল-গল্প নয়। তাঁর কথা মিথ্যা হবার নয়। সুতরাং নবীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে এ লক্ষ্যে কাজ করা সকল দ্বীনদার ঈমানদার মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য।

লাকুম দ্বীনুকুম ওলিয়াদ্বীন

দেশের কিছুলোক প্রচার করে কুরআন শরীফ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ সমর্থন করে। প্রমাণ হিসেবে তারা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত উদ্ধৃত করেন :

'লাকুম দ্বীনকুম ওলিয়াদ্বীন'– 'তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন আর আমার জন্য আমার দ্বীন।'

বিষয়টি পর্যালোচনা করা যাক :

এ আয়াতটি কুরআন শরীফের ১০৯ নং সূরা : আল-কাফিরুনের ৬ নং এবং শেষ আয়াত। এ সূরার নাম কাফিরুন অর্থাৎ অস্বীকারকারীগণ। কাফির শব্দটিকে আমাদের সমাজে গালি মনে করা হয়। কাফির শব্দের অর্থ অস্বীকারকারী। যে তাওহিদ, রেসালাত ও আখিরাত স্বীকার করে না সেই হলো কাফির, সে অস্বীকারকারী।

এ সূরা নাজিলের ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন– মক্কার কুরাইশ সর্দারগণ রাসূল (সা.) কে বলল– 'আমরা আপনাকে এতবেশি পরিমাণ ধন-সম্পদ দেব, যার ফলে আপনি মক্কার সবচেয়ে বেশি ধনী হয়ে যাবেন। যে মেয়েটি আপনি পছন্দ করেন, তার সাথে আপনার বিয়ে দিয়ে দেব। আমরা আপনার পেছনে চলতে প্রস্তুত। আপনি শুধু আমাদের একটি কথা মেনে নেবেন– আমাদের উপাস্যদের নিন্দা করা থেকে আপনি বিরত থাকবেন। এ প্রস্তাবটি আপনার পছন্দ না হলে, আমরা আরো একটি প্রস্তাব পেশ করছি– এ প্রস্তাবে আপনার লাভ, আমাদেরও লাভ।' রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন সেটা কী? তারা বলল– 'এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবেন এবং আমরা এক বছর আপনার উপাস্যদের ইবাদত করব।'

রাসূল (সা.) বললেন– 'থামো! আমি দেখি আমার রবের পক্ষ থেকে কী হুকুম আসে।'

এ সময় এ সূরাটি নাজিল হয়। সূরার বাংলায় তরজমা :

(হে রাসূল) আপনি বলে দিন, হে কাফিরগণ! তোমরা যাদের ইবাদত কর, আমি

www.nagorikpathagar.org

তাদের ইবাদত করি না। আর আমি যার ইবাদত করি, তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও। তোমরা যাদের ইবাদত করছ, আমি তাদের ইবাদতকারী নই। আর আমি যার ইবাদত করি, তোমরা তার ইবাদত করবে না। তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আর আমার জন্য আমার দ্বীন।

এ সূরার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) পরিষ্কার ভাষায় কাফেরদেরকে জানিয়ে দিলেন– 'আমার দ্বীন আলাদা এবং তোমাদের দ্বীনও আলাদা। আমার পথ ও তোমাদের পথ কখনও এক হতে পারে না। তোমাদের দ্বীন ও আমার দ্বীনের মধ্যে কোনো রকম আপোষ রফা কখনও সম্ভব নয়।'

এ আয়াতের সমার্থক আয়াত সূরা আয-যুমার এ আছে :

'হে নবী এদের বলে দাও, আমি তো আমার দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে তাঁরই ইবাদত করব, তোমরা তাকে বাদ দিয়ে যার বন্দেগি করতে চাও করতে থাক।' (আয়াত-১৪)

'এদেরকে বলে দাও– হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা নিজেদের জায়গায় কাজ করে যাও। আমিও আমার কাজ করতে থাকব। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার উপর অপমানকর আজাব আসবে এবং কার উপর ঐ আজাব আসবে, যা চিরস্থায়ী হবে।' (আয়াত ৩৯-৪০)

সূরা কাফিরুনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা তার রাসূলকে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় শিখিয়ে দিলেন যে, আপনি অস্বীকারকারীদেরকে এভাবে বলুন– 'তোমাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর উদ্দেশ্যেই আমি ইবাদতের সঠিক নিয়ম শিক্ষা দিচ্ছি। আমি যার ইবাদত করছি, একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি। এ উপদেশ মানা না মানা তোমাদের ইচ্ছা। এ বিষয়ে তোমাদের সাথে কোনো রকম আপোষ করার প্রশ্ন ওঠে না।'

অতএব কুরআন মজিদের উপরোক্ত আয়াত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, এ আয়াত সেকুলারিজমের সমর্থনকারী কোনো আয়াত নয় বরং ঠিক তার উল্টো।

একটি প্রশ্ন

মানুষ ধর্ম নিয়ন্ত্রণ করবে?

না মানুষ ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে?

যারা ইতিহাসের ছাত্র, ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেন, তারা সবাই অবগত–

www.nagorikpathagar.org

হযরত নূহ (আ.) এর সময় মহাপ্লাবন এসেছিল। মিশরের বাদশাহ ফেরাউন মুনফাতা/ মিনফিতাহ নীলনদের পানিতে ডুবে মারা গিয়েছিল। এছাড়া ইরাকে শাদ্দাদ ও নমরূদ নামে বাদশাহ ছিল, আদ, সামুদ, মাদায়েন, আসহাবে রাস (নজদ), আইকা (তাবুক), তুব্বা (সাবা) অঞ্চলে মানুষের বসবাস ছিল। এককালে এরা সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। এদের ধ্বংসের কারণ– আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন (ধর্ম) নিয়ে নবীগণ ঐ অঞ্চলে এসেছিলেন। নবীদের আনীত দ্বীন অমান্য করা এবং তাদের পূর্ববর্তী নবীদের আনীত দ্বীন বিকৃত করার জন্য তাদের উপর গজব আপতিত হয়। ইতিহাস বলে– নবীগণ যে দ্বীন নিয়ে এসেছিলেন, পরবর্তী পর্যায়ে মানুষ সে দ্বীনের উপর হস্তক্ষেপ করে। ফলে দ্বীন বিকৃত হয়ে যায়। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আগমনের আগে যে নবী আসেন, তিনি হযরত ঈসা (আ.)। তাঁর আনীত দ্বীন এবং তাঁর কাছে প্রেরিত কিতাব ইনজিলকে তার অনুসারীরা কিভাবে বিকৃত করে তারা বিপথগামী হলো, তার ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে আগের অধ্যায়গুলোতে আলোচিত হয়েছে। অতএব মানুষ যদি ধর্ম নিয়ন্ত্রণ করে, তাহলে ধর্মের কি হালত হয় খ্রিস্টবাদ তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

মুহাম্মদ (সা.) এর পর আর কোনো নবী আসবেন না। কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীন ইসলাম বহাল থাকবে। তারপরও মানুষ এ দ্বীনের উপর কম হস্তক্ষেপ করেনি। ভারতবর্ষের সম্রাট আকবর দ্বীনের উপর হস্তক্ষেপ করল, আর দ্বীন ইসলামকে তার মর্জিমত 'দ্বীনে এলাহি' বানিয়ে দিল। তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক পবিত্র আজানকে 'তানরে উলুদুর' ধ্বনি বানিয়ে ছাড়ল। তিউনেসিয়ার হাবিব বারগুইবা রমজান মাসের ফরজ রোজা রাখা নিষিদ্ধ করে দিল। সেকুলার চিন্তাবিদরা ইহজগৎ বাদে আর কোনো জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করল। তাদের একাংশ আবার আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে আরম্ভ করে রাষ্ট্রীয় সব ব্যাপারে দ্বীন ইসলামকে ঝেটিয়ে বের করে দিয়ে মসজিদ ও মাদরাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চায়। ইদানীং আবার 'মাদরাসাকে জঙ্গিবাদের প্রজনন কেন্দ্র' আখ্যা দিয়ে মাদরাসায়ও ইসলামের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করার উদ্যোগে পরিলক্ষিত হচ্ছে। মসজিদেও ইসলাম থাকবে তার নিশ্চয়তা নেই। কারণ ইতিহাস বলে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর বিশ্ববিখ্যাত হাদিসগ্রন্থ বুখারী শরীফের সংকলক ইমাম বুখারীর বুখারা, সমরখন্দ, তাসখন্দসহ ইতিহাসখ্যাত ইসলামী জনপদের মসজিদগুলো ঘোড়ার আস্তাবল ও নাট্যশালায় পরিণত হয়েছিল।

দ্বীন হলো আল্লাহপ্রদত্ত হেদায়াত। দ্বীনের ব্যাপারে নবীদেরও হস্তক্ষেপ করার কোনো সুযোগ ছিল না। কোনো মানুষ কিংবা মানব সমষ্টি ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ

www.nagorikpathagar.org

করলে খোদার উপর খোদকারী হয়ে যায়। অর্থাৎ তাদের মর্যাদা আল্লাহর উপর উঠে যায়। স্রষ্টার position নেমে যায় সৃষ্টির নিচে। সুতরাং মানুষের হাতে ধর্মের নিয়ন্ত্রণ ভার ছেড়ে দেয়া অবান্তর।

দ্বীন আল্লাহপ্রদত্ত হেদায়াত তথা মানুষের জীবনযাপন প্রণালী। মানুষ আল্লাহর সমীপে আত্মসমর্পণ করবে। দ্বীন অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। কোনো রকম বিকৃত চিন্তার প্রশ্রয় দেবে না– এটা কাম্য। অতএব মানুষ ধর্ম নিয়ন্ত্রণ করবে না– ধর্মের অনুশাসন দ্বারা সে নিজেই নিয়ন্ত্রিত হবে। এটাই সরল সঠিক পথ– সিরাতুল মুস্তাকিম।

আরো একটি প্রশ্ন

'একজন ধার্মিক লোক কি ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) হতে পারে?

উত্তর : একজন ধার্মিক ব্যক্তি তাঁকে বলা হয়, যিনি সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর হুকুম আহকাম, বিধি-বিধান আসমানি কিতাব, ধর্মগ্রন্থ, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, শেষ বিচার, জান্নাত-জাহান্নাম, স্বর্গ-নরক, বিশ্বাস করেন এবং সৃষ্টিকর্তার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার জন্য তাঁর প্রতিটি আদেশ-নিষেধ ইহজগতে যতোদূর সম্ভব মানার চেষ্টা করেন।

দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে একজন ধার্মিক ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) হতে পারে না। কেননা ধর্মনিরপেক্ষ দর্শন ইহজগৎ ও ইহজাগতিকতার বাইরে কোনো কিছু বিশ্বাস করে না। সৃষ্টিকর্তাকে ইহজগতে দেখা যায় না। আসমানি কিতাব, পুনরুত্থান, স্বর্গ-নরক ইহজাগতিক কোনো বিষয় নয়। তাই ধর্মনিরপেক্ষ দর্শনে এ বিষয়গুলোর কোনো স্থান নেই। ফলে বিশ্বাসগত দিক দিয়ে কোনো ধার্মিক ব্যক্তির ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) হবার প্রশ্ন ওঠে না।

এক ব্যক্তি একদিক দিয়ে হবেন ধার্মিক– ধর্মের পক্ষের লোক– আবার স্বয়ং তিনি হবেন ধর্মনিরপেক্ষ তথা Secular অর্থাৎ যে ধর্মের পক্ষে নয়, যিনি ধর্ম থেকে আলাদা– Independent, যার ধর্মের উপর বিশ্বাস-ভরসা-নির্ভরতা কিছুই নেই– এ যেন এক দেহের, একই অঙ্গের পরস্পরবিরোধী দুই রূপ– সোনার পাথরবাটি– বাস্তবে যার কোনো অস্তিত্ব নেই।

ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের অধীনে একজন ব্যক্তকে ব্যক্তিগত গণ্ডির মধ্যে সৃষ্টিকর্তাকে মানা এবং তাঁর পূজা-উপাসনা, ইবাদত-বন্দেগি করার ব্যাপারে কোনো আপত্তি করা হয় না। এ সুযোগ লাভ করে কোনো ব্যক্তি কি তার ধর্মের পূর্ণ হক আদায়

www.nagorikpathagar.org

করতে পারবে?

ধরুন জনৈক আবদুল্লাহ সাহেব– তিনি একজন একনিষ্ঠ, অনুগত মুসলমান। ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের অধীনে থেকে তিনি কি হক আদায় করে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে পারবেন?

মনে করুন– আবদুল্লাহ সাহেবের পারিবারিক সমস্যা সৃষ্টি হলো। তার স্ত্রী বিষয়টি আদালতে নিয়ে গেল। কিংবা তার পিতার মৃত্যু হলো। সম্পত্তি নিয়ে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলো। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি আদালতে গেল। এ পরিস্থিতিতে আবদুল্লাহ সাহেব তার পরিবার ও উত্তরাধিকারীদের মধ্যে আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে দিতে পারবেন?

আবদুল্লাহ সাহেব ধার্মিক লোক। তিনি কুরআন তেলাওয়াত করেন। তিনি সূরা মায়িদার ৪৪ নং আয়াতে পড়লেন– 'যারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না– তারাই কাফির।' তিনি কি এই আয়াতের প্রতি আমল করতে পারবেন? তিনি নিয়মিত কুরআন অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়নকালীন সময়ে তার নজরে আসল :

দাওয়াত, ইসলাহ, রিসালাত, নবীর অনুসরণ, সত্যের সাক্ষ্য, শাহাদাত, বাইয়াত, আল্লাহর পথে ব্যয়, জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, জাকাত, সুদ, জুয়া, লটারি, ধনসম্পদ উপার্জন ও ব্যয় করার পন্থা, ইসলামের হারাম-হালাল বিধান, শ্রমিকের অধিকার, নারীর অধিকার, পিতামাতার অধিকার, প্রতিবেশীর হক, শিক্ষানীতি, বিচারব্যবস্থা, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, সৃষ্টির মালিকানা, পৃথিবী ও তার প্রতিটি অংশের মালিকানা, খেলাফত, যুদ্ধ ও সন্ধি আইন, শাসন শাসিতের সম্পর্ক, জুলুমবাজ সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের করণীয়, হক্কুল্লাহ, হক্কুল ইবাদ, আমর বিন মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার ইত্যাদি। তিনি কি এ বিষয়গুলোর উপর হক আদায় করে আমল করতে পারবেন?

ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের অধীনে আবদুল্লাহ সাহেব ব্যক্তিগত গণ্ডীর সীমারেখার বাইরে কিছুই করতে পারবেন না। জুমার নামাজ, ঈদের নামাজ, হজ্জ ব্যক্তিগত গণ্ডীর সীমারেখার মধ্যে পড়ে না। জনাব আবদুল্লাহ যদি কামাল আতাতুর্কের শাসন আমলে তুরস্কে যাবার সুযোগ পেতেন, তিনি মসজিদের মিনার থেকে 'আজান' নয়, 'তানরে উলুদুর' ধ্বনি শুনতে পেতেন। তিনি যদি হাবিব বার গুইবার জামানায় তিউনেসিয়ায় চুক্তিভিত্তিক কোনো চাকরিতে যোগদান করতেন, রমজান মাসে ফরজ রোজা রাখতে পারতেন না। কারণ হাবিব বারগুইবার নির্দেশ ছিল রোজা রাখলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও জাতীয় প্রবৃদ্ধি (G.D.P.) কমে যায়।

www.nagorikpathagar.org

জনাব আবদুল্লাহ নামাজে ও নামাজের বাইরে দিনে রাতে বার বার উচ্চাণ করেন 'আল্লাহু আকবর– আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক' আল্লাহ যদি সর্বশ্রেষ্ঠ হন, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হন, তাহলে তাঁর দেয়া হুকুম-আহকাম, বিধি-বিধান কি শ্রেষ্ঠ নয়? এগুলো কি মানবরচিত আইনের অধীনে থাকবে? যে আইন রাষ্ট্র ও সমাজ, ব্যক্তি কিংবা পরিবার যে স্তরে প্রয়োগ হওয়া দরকার, তিনি কি তা প্রয়োগ করতে পারবেন? ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি কি সব আইন-কানুন মানার পরিবেশ পাবেন?

এতদসত্ত্বেও আবদুল্লাহ সাহেব সৃষ্টিকর্তার প্রতি ঈমান এবং যতদূর সম্ভব ইবাদত-বন্দেগি করার চেষ্টা অব্যাহত রাখলেন, কিন্তু তার ভবিষ্যৎ বংশধররা কি ব্যক্তিগত পর্যায়ে আল্লাহকে চেনা-জানার পরিবেশ পাবে? তারা যখন দেখবে সৃষ্টিকর্তা ব্যক্তিজীবনের বাইরে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনে বিচার ফয়সালায়, রাষ্ট্র পরিচালনায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনে কোনো বিধি-বিধান দিতে সক্ষম নন, তখন তারা কি ব্যক্তিগত জীবনে সৃষ্টিকর্তার উপর ঈমান আনার, তাঁর ইবাদত-বন্দেগি, পূজা-উপাসনা করার যুক্তি খুঁজে পাবে?

বিষয়টির গভীরে অনুপবেশ করলে পরিষ্কার হয় যে, ধার্মিক, ধর্মানুরাগী, ধর্মের পক্ষের লোক আর ধর্মনিরপেক্ষ, Secular লোক– যে ধর্মের পক্ষে নয়, যার ধর্মের উপর ভরসা কিংবা নির্ভরতা নেই, যে ইহবাদী বা ইহজাগতিকতাবাদী, তাদের উভয়ের মধ্যে চিন্তা-চেতনায়, ধ্যান-ধারণায়, ঈমানে-বিশ্বাসে, কার্যকলাপে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হবেই।

বস্তুত আমাদের পৃথিবীতে, ইহজগতে বিপরীতমুখী দ্বন্দ্ব-সংঘাত সর্বত্র বিরাজমান। আলোর সাথে আঁধারের, সত্যের সাথে মিথ্যার, নীতির সাথে নীতিহীনতার, ইলেকট্রনের সাথে পজিট্রনের বিপরীতমুখী অবস্থান সবার কাছে পরিলক্ষিত হয়। এভাবে ধার্মিকতার সাথে অধার্মিকতার বিপরীতমুখী অবস্থান, উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত একটি চিরন্তন সত্য, ঘটমান বিষয় (Phenomenon). এ বিপরীতমুখী অবস্থান, এ দ্বন্দ্ব-সংঘাতে যদি ধার্মিকতার পক্ষের শক্তির মোকাবেলায় অধার্মিকতার পক্ষের শক্তির বিজয় হয় এবং রাষ্ট্রে তাদের কর্তৃত্ব ও শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে এ রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, আর এ রাষ্ট্রের পরিচালকদের নিয়ন্ত্রিত সমাজ হয় ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ। ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ও রাষ্ট্রে নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

চতুর্দশ অধ্যায়

ইসলাম

আপনার সন্তান যদি জ্বরে আক্রান্ত হয়, কাঁপুনি দিয়ে জ্বর ওঠে, রোগী অস্থিরতা প্রকাশ করে, হাতের কাছে প্রাপ্ত প্রাথমিক ঔষধ খাবার পরও যদি জ্বর না সারে, তাহলে আপনি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে যান। ডাক্তার রোগীকে দেখেই ঔষধ প্রয়োগ করেন না। তিনি রক্ত পরীক্ষা করার জন্য প্যাথলজিস্টের কাছে পাঠান। প্যাথলজিস্ট যখন রক্ত পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেন যে, রোগীর ম্যালেরিয়া কিংবা টাইফয়েড হয়েছে, তখন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ঔষধ লিখে দেন। তারপর আপনি ফার্মাসিস্টের নিকট থেকে ঔষধ ক্রয় করে আনেন এবং আপনি নিজে, প্রয়োজনে কোনো সময় আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতায় রোগীকে ঔষধ সেবন করান।

উপরোক্ত প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মাত্র একজন নিজের চোখে রোগের জীবাণু দেখেছেন, আর বাকি সবাই প্যাথলজিস্টের কথায় ঈমান এনে ঔষধের ব্যবস্থা ও প্রয়োগ করেছেন।

আরো একটি দৃষ্টিকোণ থেকে এ বক্তব্যের অবতারণা করা যেতে পারে। মহাকাশে Black hole (কৃষ্ণ গহ্বর) আছে। Black hole এর আওতায় (Range এর মধ্যে) কোনো বিরাটাকার নক্ষত্র যদি চলে আসে, মুহূর্তের মধ্যে Black hole নক্ষত্রটিকে গিলে ফেলবে। নক্ষত্রের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। মহাকাশে এ রকম কৃষ্ণগহ্বরের সংখ্যা বহু। এ Black hole খালি চোখে দেখা যায় না। অত্যন্ত উন্নতমানের দূরবীনের সাহায্যে Black hole দেখতে হয়। যারা Black hole দেখেছেন তাদের সংখ্যা খুবই কম। অথচ বিশ্বের মানুষ বিশেষ করে বিজ্ঞানের ছাত্ররা Black hole এর অস্তিত্বে অবিশ্বাস করে না। সবাই Black hole এর অস্তিত্বে বিশ্বাসী।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কোনো কিছুর অস্তিত্ব আছে কিনা তা সব মানুষ প্রত্যক্ষ করে না। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেন, বাকি সবাই তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে। গোটা মানবসমাজে এ প্রক্রিয়া চালু আছে। এ ভূমিকা স্মরণ রেখে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে :

১. আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস

www.nagorikpathagar.org

ইসলামের দাবি আসমান ও জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে, সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মহান স্রষ্টা আল্লাহতায়ালা। তিনি এক এবং একক। তিনি সবকিছু থেকে মুখাপেক্ষহীন, সবই তাঁর মুখাপেক্ষী। না তার কোনো সন্তান আছে, না তিনি কারো সন্তান। কেউ তাঁর সমতুল্য নয়।

আল্লাহ যে কত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তা শুমার করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। গোটা বিশ্বজগতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নিদর্শন দেখেই বুদ্ধিমানরা আল্লাহর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেন।

সমগ্র বিশ্বজগতের যৎসামান্য একটি অংশ হলো পৃথিবী। আর পৃথিবীর অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে একটি সৃষ্টি হলো মানুষ।। আর মানুষের মধ্যে মুষ্টিমেয় মানুষ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না– তাদের একমাত্র যুক্তি হলো যে, আল্লাহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। মানবদেহে অসংখ্য অঙ্গ আছে। তার মধ্যে পাঁচটি অঙ্গ হলো ইন্দ্রিয়। এগুলো হলো– চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক। অবিশ্বাসীদের কথা হলো– 'যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তার অস্তিত্ব নেই।'

তাদেরকে জ্ঞাত করা হচ্ছে যে, আল্লাহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। হযরত আদম (আ.) এর মাধ্যমে পৃথিবীর সকল মানুষ অস্তিত্বে এসেছে। আদম (আ.) কে কেউ Adam, কেউ মনু আবার কেউ অন্য নামে আখ্যায়িত করে। কিন্তু তার অস্তিত্বে সামান্য সংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করে না। সেই আদম (আ.) সৃষ্টির পর প্রথম দিকে বেহেশতে অবস্থান করেন। সবাই জানে সেখানে কিছু ঘটনা ঘটেছিল। আদম (আ.) ঐ সময় বেহেশতে আল্লাহকে নিজের চোখে দেখেন এবং তাঁর সাথে বাক্য বিনিময় হয়। আল্লাহর সাথে কথা বলেন হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.), হযরত মুহাম্মদ (সা.)। (সূত্র : সূরা বাকারা, সূরা : মায়েদা এবং সূরা : বনি ইসরাইল)। কথা শুনতে ও বলতে কান ও জিহ্বার প্রয়োজন হয়। সুতরাং আল্লাহ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কমপক্ষে উপরোক্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ও ইতিহাস বিখ্যাত নবী রাসূলদের কাছে।

ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য বিষয়টি সব মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়া শর্ত নয়। বিশেষজ্ঞদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় আর সবাই তাদের কথায় বিশ্বাস করে। আল্লাহ কমপক্ষে উপরে বর্ণিত সম্মানিত নবী-রসুলদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য– আর এ নবী-রসুলগণের মর্যাদা দুনিয়ার যে কোনো প্যাথলজিস্ট ও দূরবীনে প্রত্যক্ষ করতে পারদর্শী বৈজ্ঞানিকের মর্যাদার চাইতে নিঃসন্দেহে অনেক বেশি।

আল্লাহ্ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী

প্রথমে সার্বভৌমত্ব বলতে কী বুঝায় তা জানার চেষ্টা করা যাক :

www.nagorikpathagar.org

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Blackstone এর মতে সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা :
Sovereign power means the supreme, irresistable, absolute and uncontrolled authority.
সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে সর্বোচ্চ, অপ্রতিরোধ্য, চূড়ান্ত ও অনিয়ন্ত্রিত কর্তৃপক্ষকে বুঝায়।
অধ্যাপক বার্জেসের মতে- Sovereignty is the original, absolute power, over the individual subject and over all association of subjects.
সার্বভৌমিকতা হচ্ছে ব্যক্তি প্রজা অথবা প্রজাদের সামষ্টিক সংস্থাসমূহের উপর মৌলিক ও চূড়ান্ত এবং অপরিসীম ক্ষমতা।
John Austin বলেন :
Law is the command of sovereign.
সার্বভৌমের আদেশই হলো আইন।

সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য

১। সার্বজনীনতা (Universality)
২। চরমতা (Absoluteness)
৩। অবিভাজ্যতা Indivisibility)
৪। স্থায়িত্ব (Permanence)
৫। হস্তান্তর অযোগ্যতা (Inalienability)
৬। এককত্ব Exclusiveness)
৭। ব্যাপকতা (Comprehensiveness)
৮। অভ্রান্ত (Unerring)

সার্বভৌমত্বের উপরোক্ত সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহতায়ালা। আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মানুষ কিংবা মানব সমষ্টি উপরোক্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া অসম্ভব।
উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ ইংল্যান্ডের King in Parliament- রাজা সমেত আইন সভাকে আইনসম্মত সার্বভৌমত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসেবে পেশ করেন। এ অভিমত কতটুকু সঠিক, বাস্তব ও যুক্তিসঙ্গত

www.nagorikpathagar.org

তা যাচাই করে দেখা যাক :

সবাই জানে এককালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এত বিস্তৃত ছিল যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কখনও সূর্য অস্তমিত হতো না। কিন্তু বর্তমানে ব্রিটিশ এখন সাম্রাজ্য নয়, বিলাতের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাজত্ব। সুতরাং অতীতে যাদের উপর King in Parliament এর আদেশ চলত, এখন তা চলে না। তাদের মধ্যে সার্বজনীনতা নেই। আগের কলোনি ও তার বাসিন্দাদের উপর তাদের চরম ক্ষমতা অচল। রাজা-রানী ও আইনসভার সদস্যরা permanent নন– তাদের মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। তাদের সাম্রাজ্যের আওতাধীন রাষ্ট্রগুলো স্বাধীন হয়ে যাবার কারণে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা কার্যত ভাগাভাগি হয়ে গেছে। বর্তমানে তাদের যতটুকু ক্ষমতা আছে ভবিষ্যতে তাও থাকবে কিনা প্রশ্নসাপেক্ষ। ২০১৪ সালে স্কটল্যান্ডের ৪৫% নাগরিক স্বাধীন হবার পক্ষে ভোট দিয়েছে।

মানুষ বা মানব সমষ্টির উপর আরোপিত সার্বভৌম ক্ষমতার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণের যদি অবস্থা এই হয় তাহলে এর চেয়ে কম সার্বভৌম ক্ষমতার মালিকদের ব্যাপারে আলোচনার প্রয়োজন পড়ে না। ফলে এ কথা স্বীকার করে নেয়া ছাড়া উপায় নেই যে, সার্বভৌমত্বের সার্বিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য একমাত্র মহান আল্লাহতায়ালার উপর প্রযোজ্য আর কারো উপর নয়।

'তিনি আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কেউই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক নয়। তিনি সমগ্র বিশ্বকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছেন। তিনি চিরঞ্জীব ও চির প্রতিষ্ঠিত। ঘুম ও তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তাঁর। কে আছে এমন যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তিনি সবকিছুর অগ্র-পশ্চাতের খবর রাখেন। তার জ্ঞাত বিষয়ের কিছুই মানুষের জ্ঞান সীমানার আওতাধীন হতে পারে না। অবশ্য কোনো বিষয়ের জ্ঞান তিনি নিজেই যদি কাউকে জানাতে চান (তবে অন্য কথা)। তার সামাজ্য আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে। এ সবের রক্ষণাবেক্ষণ এমন কোনো কাজ নয়, যা তাঁকে ক্লান্ত করে দিতে পারে। বস্তুত তিনি হচ্ছেন এক মহান ও শ্রেষ্ঠতম সত্তা।' (সূরা : বাকারা, আয়াত ২৫৫)

'সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো নয়।'

(সূরা : ইউসুফ, আয়াত ৬৭)।

'সাবধান সৃষ্টি যার হুকুম দেবার ক্ষমতা একমাত্র তাঁর।'

(সূরা : আল-আরাফ, আয়াত ৫৪)

'তিনি আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু তিনি জানেন। তিনিই রহমান ও রাহিম। তিনি আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।

www.nagorikpathagar.org

তিনি মালিক-বাদশাহ! অতীব মহান পবিত্র। পুরোপুরি শান্তি নিরাপত্তা। শান্তি নিরাপত্তা দাতা। সংরক্ষক, সর্বজয়ী, নিজের নির্দেশ বিধান শক্তি প্রয়োগে কার্যকরকারী এবং স্বয়ং বড়ত্ব গ্রহণকারী। আল্লাহ পবিত্র মহান সে শিরক থেকে যা লোকেরা করে। তিনি আল্লাহ, যিনি সৃষ্টি-পরিকল্পনা রচনাকারী ও তা বাস্তবায়নকারী এবং সে অনুযায়ী আকার আকৃতি রচনাকারী।' (সূরা : হাশর, আয়াত ২২-২৪)

'আল্লাহ কি সব শাসনকর্তার বড় শাসনকর্তা নন?' (সূরা : তীন, আয়াত ৮)

পৃথিবীর আগের পরের ও বর্তমান সকল মানুষকে আল্লাহ তাঁর প্রতিনিধি (খলিফা) বানিয়ে সৃষ্ট করেছেন। মানুষের দায়িত্ব হলো আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশ বাস্তবায়ন করা। যার কাজে আল্লাহর ইচ্ছা প্রতিফলিত হবে সে হবে পুরস্কৃত আর বিপরীত হলে সে হবে তিরস্কৃত।

২. ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস

ফেরেশতা আল্লাহর মনোনীত সৃষ্টি। তাদের প্রকৃতি এমন যে, তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করতে পারে না। আল্লাহ তাদের মাধ্যমে সৃষ্টিজগৎ পরিচালনা করেন। তাদের নিজের কোনো ইচ্ছা নেই, স্বাধীন ক্ষমতাও নেই। তারা সর্বক্ষণ আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল থাকেন। তাদের সর্দার হযরত জিবরাঈল (আ.)– হযরত আদম (আ.) থেকে আরম্ভ করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত কমপক্ষে ১,২৪,০০০ পয়গম্বরের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অহি নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাদের আরো এক সর্দার হযরত আজরাঈল (আ.) এর নেতৃত্বে একদল ফেরেশতা আছেন, যারা আল্লাহর হুকুমে মানুষের আত্মা তার দেহ থেকে বের করে নিয়ে যান। আত্মা দেহ থেকে বের হবার সাথে সাথে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয় আর লাশ হয়ে পড়ে থাকে। ফেরেশতাদের আরো এক অংশ মানুষের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেন এবং ভালমন্দ সকল কাজের রেকর্ড সংরক্ষণ করেন। এই রেকর্ডকৃত আমলনামা মানুষের সামনে হাশরের দিন হাজির করা হবে। ফেরেশতাদের স্বরূপ দেখা যায় না। তারা রূপ বদলাতে সক্ষম। তবে আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) জিবরাঈল (আ.) কে তার আসলরূপে দুইবার দেখেছিলেন।

৩. আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস

আল্লাহ নবীদের মাধ্যমে মানুষের হেদায়েতের জন্য কিতাব প্রেরণ করেছেন। কুরআন পাকে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর প্রতি প্রেরিত কিতাব সুহুফে ইবরাহীম,

www.nagorikpathagar.org

হযরত মূসা (আ.) এর প্রতি প্রেরিত কিতাব তাওরাত, হযরত দাউদ (আ.) এর প্রতি প্রেরিত কিতাব যাবুর এবং হযরত ঈসা (আ.) এর প্রতি প্রেরিত কিতাব ইঞ্জিলের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এর বাইরেও আল্লাহর কিতাব নবীদের কাছে এসেছে। কিন্তু কোনটি আল্লাহর কিতাব- এ সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত নই। আল্লাহর নিকট থেকে নাজিলকৃত সকল কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি প্রেরিত কিতাব আল কুরআন ব্যতীত আর কোনো কিতাব আসল (Original) রূপে নেই। কোথাও কিতাব গায়েব হয়ে গেছে। কোথাও কিতাবের ভাষা গায়েব হয়ে গেছে। কোথাও আল্লাহর কালাম ও মানুষের কালাম এমনভাবে মিশে গেছে যে, কোনটি আল্লাহর কালাম আর কোনটি মানুষের কালাম তা বের করার সাধ্য নেই।

আল কুরআনে এ রকম হয়নি এবং হবারও কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ আল্লাহ বলেন :

'আমি এ উপদেশনামা (কুরআন) নাজিল করেছি এবং নিশ্চয়ই আমি এর হেফাজতকারী। (সূরা : হিজর, আয়াত ৯)

আল কুরআনের প্রারম্ভে আল্লাহ বলেন- কুরআন এমন একখানা কিতাব যেখানে সন্দেহজনক কোনো কিছুই সংযোজিত করা হয়নি।

'বলুন- যদি সমস্ত মানবকুল ও জিন জাতি একত্রিত হয়ে এ কিতাবের মতো একখানা কিতাব রচনা করার জন্য একে অন্যকে সাহায্য করে, তবুও এ কিতাবের মতো একখানা কিতাব রচনা করতে সক্ষম হবে না।'

(সূরা : হাশর, আয়াত ২১)

আল কুরআন অতীতে নবী-রসুলদের কাছে আগত সকল আসমানি কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী।

৪. আখিরাতের উপর বিশ্বাস

একদিন আল্লাহতায়ালা বিশ্বজগৎ এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছু ধ্বংস করবেন। এ সময়ের নাম কিয়ামত। আবার সবার পুনরুত্থান হবে। সবাই আল্লাহর সামনে হাজির হবে। এটাই হলো হাশর। ঐ দিন মানুষ দুনিয়ার জীবনে কে কি করেছে তার বিচার হবে। যার নেকির পাল্লা ভারী হবে, তাকে বেহেশতে দাখিল করা হবে। আর যার মন্দের পাল্লা ভারী হবে, তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। বেহেশত ও দোযখের বাসিন্দারা চিরদিন সেখানে অবস্থান করবে।

মৃত্যুর পর আবার জীবিত কিভাবে হয়- এ ব্যাপারে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর

www.nagorikpathagar.org

মনে খটকা সৃষ্টি হয়েছিল :

'সে ঘটনা স্মরণ রেখো– যখন ইবরাহীম বলেছিল– 'হে আমার রব, আমাকে দেখিয়ে দাও– তুমি মৃতকে কিভাবে পুনরুজ্জীবিত কর।' আল্লাহ্ বলেন, 'তুমি কি তা বিশ্বাস কর না?' তিনি বললেন, 'বিশ্বাস তো আমি করি কিন্তু মনের সান্ত্বনার প্রয়োজন।' আল্লাহ্ বললেন– 'তবে তুমি চারটি পাখি ধর এবং এগুলোর সাথে সুপরিচিত হয়ে যাও। অতঃপর ওদের একেকটি অংশ একেকটি পাহাড়ের উপর রেখে দাও। এখন তুমি তাদেরকে ডাক– তারা তোমার নিকট দৌড়ে আসবে। বিশেষভাবে জেনে নাও যে, আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমতাশালী ও বিজ্ঞানী।'

(সূরা : বাকারা, আয়াত ২৬০)

এভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হবার দৃশ্য নিজ ইন্দ্রিয় চোখের সাহায্যে দেখেছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) শবে মেরাজে আসমানে ভ্রমণকালীন সময় আল্লাহর সাথে কথা বলেন। তিনি বেহেশত ও দোযখ নিজ চোখে দেখেন। তার আগের নবীদের কয়েকজনের সাথে তার দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়, যাঁরা বহু আগে ইন্তেকাল করেছিলেন। সুতরাং হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নিকট আল্লাহ্, ফেরেশতা, বেহেশত, দোযখ, মৃত্যুর পর আবার জীবিত হবার দৃশ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছিল।

৫. নবুওয়তের প্রতি বিশ্বাস

কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন আছে, যেগুলোর উত্তর নির্ধারণ না করে আমার সামনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। এগুলো হলো আমার দেহে শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষুধা, অনুভূতি, প্রতিভা ইত্যাদি আছে। আমার সামনে আছে অসংখ্য দ্রব্যসামগ্রী। এর মধ্যে কিছু জিনিস ব্যবহার করার ক্ষমতা ও শক্তি আমার আছে। আমার সামনে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী আছে। জীবনের প্রয়োজনে এ সবের সাথে আমার সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। এ সবের সাথে কিভাবে আচরণ করতে হবে তা নির্ধারণ না করে আমার জীবন ধারণ করা সম্ভব নয়। ফলে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর আমাকে পেতেই হবে। এগুলো হলো :

(কা) আমি কে? কোথা থেকে এলাম? আমার কোনো দায়-দায়িত্ব আছে কি?

(খ) আমি স্বাধীন, স্বেচ্ছাচারী, না কারো অধীন। যদি অধীন হই, কার অধীন, কার কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে?

(গ) মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যাব, না তারপর আরো এক জীবন আছে? যদি জীবন থাকে, সে জীবনের স্বরূপ কী? এ জীবনের সাথে ঐ জীবনের কোনো সম্পর্ক আছে কি? ঐ জীবনের জন্য ইহজীবনে করণীয় আছে কী?

www.nagorikpathagar.org

(ঘ) আমার দেহের শক্তি, সামর্থ্য, প্রতিভা, বিবেক ইত্যাদি কোথা থেকে পেলাম- এগুলো কি কারো দান?

(ঙ) আমার চারপাশের লোকজনের সাথে বন্ধুত্ব, শত্রুতা, সহযোগিতা, অসহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা করা ইত্যাদি স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজন হয়। এগুলোর ভিত্তি কি হবে?

এসব প্রশ্নের জবাব বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন মানুষ, বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। এদের সবাই সব ব্যাপারে একমত নন। তাদের সবাইকে Study করে মত নির্ধারণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে একটি সমাধান আমার কাছে আছে। তা হলো- দুনিয়ার প্রথম মানুষ ও নবী হযরত আদম (আ.) থেকে আরম্ভ করে আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত কমপক্ষে এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর দুনিয়াতে এসেছেন। তাঁরা বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন কওমের লোকজনের মধ্যে এসেছেন। তাঁরা সবাই আলোচ্য প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়েছেন। তাঁদের প্রদত্ত জবাবের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। সুতরাং তাদের নিকট থেকে উপরোক্ত মৌলিক প্রশ্নগুলোর সমাধান গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ। তাঁদের কাছ থেকে সমাধান গ্রহণ করলে ইহজীবনে শান্তি বিরাজ করবে- এটা ইতিহাসের সাক্ষ্য। আর তাদের দাবি তাদের কথামতো জীবনযাপন করলে পরকালেও সুখ ও শান্তিতে থাকা সম্ভব হবে। আর তাদের দেয়া সমাধানের বিরুদ্ধে চললে চরম অসুখ ও অশান্তির মধ্যে চিরদিন থাকতে হবে। তাঁদের দাবি তাঁরা মহান আল্লাহর কাছ থেকে এ জ্ঞান পেয়েছেন এবং তারা অনেক কিছু তাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করেছেন। এরা হলেন নবী ও রসুল। আল্লাহ্ তাদেরকে বাছাই করেছেন। তাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা হলো নবুওয়তের দায়িত্ব। যেখানে আমার এক জীবনে আমার নিজের দ্বারা সকল মৌলিক প্রশ্নের সমাধান লাভ করা সম্ভব নয়, যেখানে দুই দার্শনিক সব ব্যাপারে একমত হন না, সেখানে নবীদের উপর আস্থা স্থাপন করে জীবন পরিচালনা করে বুদ্ধিমানের কাজ। ইসলাম এটাই দাবি করে আর এ দাবি পূরণ করলে নবুওয়তের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা হয়।

ইসলামের সমাজ-বিধান, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

Man is by nature a social animal. মানুষ প্রকৃতিগতভাবে সামাজিক জীব। সমাজ বাদ দিয়ে মানুষ তার যাবতীয় প্রয়োজন একাকী পূরণ করতে পারে না। সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে তাকে জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণ যোগাড় করতে হয়। সমাজবদ্ধ বসবাস মানুষের প্রকৃতিগত প্রবণতা ও দাবি।

বর্তমান যুগকে Specialization এর যুগ বলা হয়। আজকাল সমাজবিজ্ঞানের

www.nagorikpathagar.org

প্রতিটি শাখায় অধিক হারে বিশেষজ্ঞ তৈরি হচ্ছেন। তারা তাদের Subject (বিষয়) গবেষণা করে এমন মত প্রকাশ করা আরম্ভ করছেন যে, তাদের গবেষণালব্ধ সমস্যাই মানবজাতির আসল সমস্যা– অন্যান্য সমস্যা আসল সমস্যার শাখা-প্রশাখা মাত্র। যেমন অর্থনীতিবিদদের এক অংশ দাবি করেন– অর্থ সমস্যাই মানুষের আদি ও আসল সমস্যা। অন্যান্য সমস্যা অর্থনীতির শাখা-প্রশাখা মাত্র। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারলে মানুষের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। পৃথবীতে বেহেশতের শান্তি নেমে আসবে। মনোবিজ্ঞানী সিগমান্ড ফ্রয়েড দাবি করেন যৌন সমস্যাই মানুষের একমাত্র সমস্যা। অন্যান্য সমস্যা এর উপজাত মাত্র।

বাস্তবতা কি তাই?

১. মানুষের জীবনে টাকা-পয়সার প্রয়োজন। কিন্তু অর্থই জীবনের একমাত্র চাহিদা নয়। তাই অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।

২. মানুষের একটি দেহ আছে। এদিক দিয়ে সে Physiology (শরীরবিদ্যা) নামক প্রকৃতি বিজ্ঞানের অধীন। কিন্তু প্রকৃতি বিজ্ঞান তার সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম নয়।

৩. যৌন প্রবৃত্তি মানুষের জীবনের একটি অত্যাবশ্যকীয় দিক। এর মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি ও মানব সভ্যতা সচল থাকে। তাই বলে যৌন বিজ্ঞানের মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান হতে পারে না, যেমনটা দাবি করেন বৈজ্ঞানিক ফ্রয়েড।

৪. মানুষ মন, বুদ্ধি ও যুক্তির অধিকারী। কিন্তু মনোবিজ্ঞান ও যুক্তিবিদ্যার সাহায্যে সকল সমস্যার সমাধান হয় না।

৫. মানুষকে সমাজে বসবাস করতে হয়। সমাজে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সমস্যা লেগেই থাকে। সমস্যা সমাধান করার জন্য আইন-কানুনের প্রয়োজন হয়। আবার আইন প্রয়োগের জন্য কর্তৃপক্ষের দরকার। কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করার জন্য লাগে শক্তি। রাষ্ট্রশক্তি ব্যতীত অন্য শক্তি ব্যবহার করলে সমস্যা মোটেই কমে না বরং চক্রাকারে বৃদ্ধি পায়। তাই রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রশক্তি অত্যাবশ্যক। এ দৃষ্টিকোণ সামনে রেখেই সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জন্ম। তাই বলে সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের সকল সমস্যার সমাধান করে ফেলার কোনো সম্ভাবনা নেই।

www.nagorikpathagar.org

মানবজীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ রয়েছে। এটা বাস্তব সত্য। প্রতিটি দিক ও বিভাগের জন্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন আলাদা আলাদা ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির মাধ্যমে জীবনব্যবস্থা রচনা করে মানবজীবনের সার্বিক সমস্যার সমাধান করতে চাইলে তা জগাখিচুড়ি ছাড়া আর কিছুই হবে না। আর এর মাধ্যমে সমস্যার সমাধান তো হবেই না বরং সমস্যা ক্রমে জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকবে।

মানুষের সার্বিক সমস্যার সমাধানে আল্লাহতায়ালার প্রদর্শিত পথ

মানুষ তার সমগ্র সত্তা ও বিভাগ সমন্বয়ে সে বিশ্বভূমণ্ডলের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার একটি অংশমাত্র। কাজেই এখানে দেখার বিষয়– সামগ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থাপনা তার অবস্থান কোথায়? তার জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী? তার কর্মপ্রেরণার উৎস কী? তার পরিণতি কী? এ বিষয়গুলো সঠিকভাবে নির্ধারণের পর তার জীবনদর্শন ও কর্মনীতি বিরচিত হতে পারে।

সমগ্র বিশ্বভূমণ্ডলে পাঁচ লক্ষাধিক সৃষ্টির (species) মধ্যে মানুষ একটি সৃষ্টি (মখলুক)। অবশ্য মানুষ সৃষ্টির সেরা– আশরাফুল মখলুকাত। তাকে সমস্ত মখলুকের স্রষ্টা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। শুধু সৃষ্টিই করেননি– মানবজাতিকে (শুধু মুসলমান নয়) খেলাফতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। সে যেহেতু আল্লাহর প্রতিনিধি, তাই কিভাবে সে প্রতিনিধিত্বের (খেলাফতের) দায়িত্ব প্রতিপালন করবে– এ ব্যাপারে মানুষকে মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে ছেড়ে দেয়া হয়নি। আল্লাহর প্রথম মানুষ আদমকে সৃষ্টি করে সর্বপ্রকার জ্ঞান শিক্ষা দান করেন। (ও আল্লামা আদামাল আসমায়া কুল্লাহ– সূরা : বাকারা, আয়াত ৩১) অতঃপর আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টিতব্য সকল মানুষের রূহ সৃষ্টি করে তাদেরকে চেতনা ও কথা বলার শক্তি দান করে জিজ্ঞেস করেন–

'আমি কি তোমাদের রব নই? সকল রুহ জবাব দিল–' নিশ্চয়ই আপনি আমাদের প্রতিপালক– আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি। (সূরা : আরাফ, আয়াত-১২২) অতঃপর আল্লাহ তায়ালা সকল রুহকে আলমে আরওয়াহে (রুহের জগতে) অবস্থান নিতে বলেন। আল্লাহর পরিকল্পনা অনুসারে ইহজগতে (আলমে দুনিয়ায়) মানুষজাতি তার মায়ের ঠিকানায় জন্ম নিতে আরম্ভ করেছে। কিয়ামত পর্যন্ত এ সিলসিলা চলতে থাকবে।

মানুষের জন্ম হবে। আবার প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে সে মারা যাবে। মৃত্যুর পর তার রুহ আলমের বরযখে (পর্দার জগতে)– অবস্থান নেবে। আবার হাশরের দিন সৃষ্টির প্রথম থেকে আরম্ভ করে শেষ মানুষটি পর্যন্ত সবার সশরীরে পুনরুত্থান হবে। তাদেরকে আল্লাহর সমীপে বিচারের জন্য পেশ করা হবে।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য আদমকে বেহেশতে অবস্থান করান। সেখানে তাকে সঙ্গ দেবার জন্য হাওয়াকে সৃষ্টি করেন। অতঃপর ইবলিশের কুপ্রেরণায় কিছু অঘটন ঘটার পর আদম, হাওয়া ও ইবলিশকে ইহজগতে (আলমে দুনিয়ায়) প্রেরণ করেন, যেখানে পাঠানোর জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

প্রথম মানুষ আদম (আ.) কে নবী ও রাসূল বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠানো হয়। তাঁর সাথে দেয়া হয় মানুষের জীবনযাপন প্রণালী (হেদায়াত, দ্বীন, ধর্ম)। নবী প্রেরণের এ সিলসিলা বা ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। যেখানে মানুষের বসবাস– সেখানেই নবী প্রেরণ করা হয়। তাদের সংখ্যা কমপক্ষে এক লাখ চব্বিশ হাজার। নবীগণ তাদের যুগে তাদের কওমের নিকট নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুরূপে পালন করে।

সর্বশেষে আগমন করেন আখেরি নবী রাহমাতুললিল আলামিন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনি সাধারণ মানুষের সাথে সাথে পূর্ববর্তী নবীদের সকল পথভ্রষ্ট উম্মতকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানান এবং সমগ্র দুনিয়ায় সংশোধন ও সংস্কার সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আন্দোলন করে দ্বীন কায়েম করেন।

শেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ইন্তেকালের পর উম্মতে মোহাম্মদীর পরিচালনায় দায়িত্ব অর্পিত হয় খোলাফায়ে রাশিদার উপর। খোলাফায়ে রাশিদা হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.) নবীর প্রতিনিধি খলিফা হিসেবে এ দায়িত্ব প্রতিপালন করেন। তাদের খেলাফতকাল ছিল খিলাফত আলা মিনহাজুন নবুওয়াত।

নবী ও খোলাফায়ে রাশিদার পরিচালিত রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ :

১. রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ছিল– মানুষের সত্যিকার কল্যাণ সাধন ও নাগরিকদের মধ্যে ইনসাফ কায়েমকরণ।

২. ভালো কাজের আদেশ দান এবং মন্দ ও অকল্যাণের প্রতিরোধকরণ।

৩. নাগরিকদের মধ্যে বংশ, গোত্র, বর্ণ, ভাষা, শ্রেণী, সম্প্রদায়, ফের্কা কিংবা ভৌগোলিক জাতীয়তার ভিত্তিতে বিভক্তকরণের সব ধারণা নির্মূল করে খালেছ মানবিক চেতনাসম্পন্ন ও মাধুর্যপূর্ণ সমাজ গঠন।

৪. দেহ ও আত্মার সংঘাততত্ত্ব রুহবানিয়াত বা বৈরাগ্যবাদের ভিত্তিতে গড়ে উঠা চিন্তাধারা বিদূরিত করে দ্বীন ও দুনিয়া তথা ইহজাগতিকতা ও পারলৌকিকতার সমন্বয় সাধন।

৫. প্রতিটি নাগরিকের এমনকি রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অবস্থানকারী

www.nagorikpathagar.org

প্রাণীকুলের খাদ্যের আর মানুষের বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা প্রদান।

৬. মানুষের ইজ্জত, আবরু ও রক্তের নিরাপত্তা প্রদান।

৭. সকল মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, মতপ্রকাশ, পেশা গ্রহণ, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি মৌলিক মানবিক অধিকারের স্বাধীনতা প্রদান।

৮. আইনের শাসন কায়েম।

রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ

মৌলিক বিষয়সমূহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় পরামর্শের ভিত্তিতে। 'তাদের কার্যাবলি পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হয়।' (সূরা : শুরা, আয়াত ৩৫)

পরামর্শ প্রদানকারী ব্যক্তি বাছাই, পরামর্শ গ্রহণ পদ্ধতি, পরামর্শ সভা (আইন পরিষদ) ইত্যাদি ব্যাপারে ইজতিহাদ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। কারণ অবস্থার পরিবর্তনের ফলে পার্থক্য হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। তবে মূল জিনিস- লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ভাবধারা অপরিবর্তিত রেখে ইজতিহাদ করা যাবে।

রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগ

রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ ছিল। যথা : ১. আইন বিভাগ ২. শাসন বিভাগ ও ৩. বিচার বিভাগ।

বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ থেকে পৃথক ও স্বাধীন ছিল। রাষ্ট্রপ্রধান তথা খলিফা ছিলেন রাষ্ট্রীয় সম্পদের আমানতদার, মালিক ছিলেন না।

রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন

আলোচিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন স্বয়ং রাসূল (সা.)। তিনি যেহেতু ছিলেন আল্লাহর মনোনীত। তাই এখানে জনগণের মতামতের কোনো সুযোগ ছিল না। রাসূল (সা.) এর ইন্তেকালের পর খলিফা হন জনগণ দ্বারা নির্বাচিত। খলিফা নির্বাচন পদ্ধতি ইজতিহাদযোগ্য- কেননা চার খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন চার পদ্ধতিতে।

খোলাফায়ে রাশেদার পর খেলাফত বিনষ্ট হয়। মানবরচিত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজতন্ত্র তথা মানবসৃষ্ট কোনো তন্ত্রমন্ত্র আল্লাহর বান্দা ও নবীর উম্মত কোনো অবস্থাতেই মানতে পারে না। ফলে তাদের দায়িত্ব হয়ে যায় আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর নির্দেশ *** অনুসারে জামাতবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে খিলাফত আলা মিনহাজুন নবুওয়ত ফিরিয়ে আনা। আর এ জন্য আল-জামাত (একমাত্র

www.nagorikpathagar.org

দল) গঠনের প্রয়োজন নেই। কেননা আল জামাত গঠন করতে পারেন কেবলমাত্র নবী ও খোলাফায়ে রাশেদিন। খিলাফত আলা মিনহাজুন নবুওয়তের অবর্তমানে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জামাত গঠিত হবে। প্রয়োজনে তাদের মধ্যে সমন্বয়ে হবে। সবার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে এক ও অভিন্ন। আর তা হলো খেলাফত আলা মিনহাজুন নবুওয়ত পুনঃপ্রতিষ্ঠা। প্রতিটি কালেমায় বিশ্বাসী মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য (ফরজ) এ লক্ষ্যে আন্দোলন করা। খেলাফত আলা মিনহাজুন নবুওয়ত পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলে সমগ্র মানবজাতির সামগ্রিক সমস্যার সমাধান হবে। এটাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তরিকা, তাঁদের সুন্নত, তাঁদের প্রদর্শিত পথ।

টীকা

**১. 'তোমরা সে সর্বোত্তম উম্মত– মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের উত্থান। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখবে।' (সূরা : আলে ইমরান, আয়াত ১১০)*

* ২. হাদিস

হযরত হারিসুল আশয়ারী (রা.) থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, রসুল (সা.) বলেছেন– 'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি জিনিসের নির্দেশ দিচ্ছি, যা আমাকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন– তা হলো :

১. তোমরা জামাতবদ্ধ হবে (দল গঠন করবে);

২. নেতার আদেশ শ্রবণ করবে;

৩. আনুগত্য করবে;

৪. হিজরত করবে;

৫. আল্লাহর রাস্তায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে (জিহাদ করবে)।

অতঃপর যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের হলো, নিশ্চয়ই সে তার গর্দান থেকে ইসলামের রজ্জু খোলে ফেলে দিল, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের দিকে (অর্থাৎ মানবরচিত মতবাদের দিকে) আহ্বান জানালো, সে সরাসরি জাহান্নামে নিপতিত হবে। সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ, সে যদি নামাজ পড়ে ও রোযা রাখে? রাসূল (সা.) বললেন– যে যদি নামাজ পড়ে, রোযা রাখে, এমনকি দাবি করে– আমি মুসলমান।' (আহমদ ও তিরমিযি)

* ৩. 'হে মুহাম্মদ! তোমার রবের কসম, এরা কখনও মুমিন হতে পারবে না,

www.nagorikpathagar.org

যতক্ষণ তারা তাদের পারস্পরিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে তোমাকে ফয়সালাকারী হিসেবে মেনে না নেবে। তারপর তুমি যা ফয়সালা দেবে, তার ব্যাপারে নিজেদের মনের মধ্যে কোনো রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্বের স্থান না দিয়ে সর্বান্তকরণে তা মেনে নেবে।' (সূরা : নিসা, আয়াত-৬৫)

কুরআনের এ আয়াতটির নির্দেশ কেবল রাসূল (সা.) এর জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং কিয়ামত পর্যন্ত একটি কার্যকর। রাসূল (সা.) আল্লাহর নিকট থেকে যা কিছু এনেছেন এবং আল্লাহর দেয়া হেদায়াতের ভিত্তিতে যে পদধতিতে তিনি কাজ করেছেন, তা চিরস্থায়ীভাবে মুসলমানদের জন্য চূড়ান্ত ফয়সালাকারী সনদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই সনদ মানা ও না মানার উপর ব্যক্তির মুমিন হওয়া ও না হওয়া নির্ভর করে। এ ব্যাপারে রাসূল (সা.) এর একটি হাদিস নিম্নরূপ :

'তোমাদের কোনো ব্যক্তি মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি, আমি যে পদ্ধতি প্রবর্তন করেছি, তার অধীনতা স্বীকার করে নেবে।' (মিশকাত)

উপরে বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ বলেন- 'আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল (সা.) এর উপর যা কিছু নাজিল করেছেন, সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করা ও শাসনকার্য পরিচালনা করা ওয়াজিব। এ কথা যে বিশ্বাস করে না বরং আল্লাহর বিধানের বিপরীতে তার নিজের মনগড়া ও ব্যক্তি ইচ্ছা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হালাল মনে করে, সে নিঃসন্দেহে মুমিন নয়- মুসলিম নয়।'

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফিজ ইবনে কাছীর তাঁর প্রখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন- আল্লাহ উক্ত আয়াতে তাঁর নিজের কসম খেয়ে বলেছেন, কেউই ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না সে রাসূল (সা.) কে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে এক কথায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিচারক মনে করবে এবং তাঁর সিদ্ধান্ত সর্বান্তকরণে অনুসরণ করবে এবং তাঁর ফয়সালা মেনে নিতে কোনো প্রকারের দ্বিধাবোধ করবে না। হাফিজ ইবনে কাছীর এ পর্যায়ে হাদিস উদ্ধৃত করেন :

১. হযরত হাসান বুসার্হারের (রা.) বর্ণনা- রাসূল (সা.) বলেন- 'যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান ব্যতিরেকে (মানবরচিত বিধান দিয়ে) কোনো বিষয়ের ফয়সালা করে, সে যেন জাহিলি রীতি অনুযায়ী বিচার কাজ সম্পন্ন করল।'

২. ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- রাসূল (সা.) বলেছেন- 'মানুষের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সর্ব নিকৃষ্ট যে ইসলামে অবস্থান করে জাহিলি রীতি অনুসন্ধান করে।'

www.nagorikpathagar.org

উপসংহার

১. 'সমগ্র বিশ্ব-জাহানের প্রভু, সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও একচ্ছত্র শাসক সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ এ পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাকে দান করেছেন জানার, বুঝার ও চিন্তা করার ক্ষমতা। ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার, নির্বাচন, ইচ্ছা ও সংকল্প করার এবং নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করার স্বাধীনতা দান করেছেন। এক কথায় মানুষকে এক ধরনের স্বাধীনতা (Autonomy) দান করে তাকে দুনিয়ায় নিজের খলিফা বা প্রতিনিধি পদে অভিষিক্ত করেছেন।

২. মানুষকে এই পদে নিযুক্ত করার সময় বিশ্ব-জাহানের প্রভু সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষের মনে এ কথা দৃঢ় বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন : আমিই তোমাদের এবং সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির একমাত্র মালিক, মাবুদ ও প্রভু। আমার এই সাম্রাজ্যে তোমরা স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী নও, কারোর অধীনও নও এবং আমার ছাড়া আর কারো তোমাদের বন্দেগি, পূজা ও আনুগত্য লাভের অধিকারও নেই। দুনিয়ার এই জীবনে তোমাদেরকে কিছু স্বাধীন ক্ষমতা ইখতিয়ার দিয়ে পাঠানো হয়েছে। এটি আসলে তোমাদের জন্য পরীক্ষাকাল। এই পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে তোমাদের আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তোমাদের কাজগুলো যাচাই-বাছাই করে আমি সিদ্ধান্ত নেবো তোমাদের মধ্য থেকে কে সফল হলো এবং কে হলো ব্যর্থ। তোমাদের জন্য সঠিক কর্মনীতি একটিই : তোমরা আমাকে মেনে নেবে তোমাদের একমাত্র মাবুদ ও শাসক হিসেবে। আমি তোমাদের জন্য যে বিধান পাঠাবো সেই অনুযায়ী তোমরা দুনিয়ায় কাজ করবে। দুনিয়াকে পরীক্ষাগৃহ মনে করে এই চেতনা সহকারে জীবন-যাপন করবে যেন আমার আদালতে শেষ বিচারে সফলকাম হওয়াই তোমাদের জীবনের আসল উদ্দেশ্য। বিপরীত পক্ষে এর থেকে ভিন্নতর প্রত্যেকটি কর্মনীতি তোমাদের জন্য ভুল ও বিভ্রান্তিকর। প্রথম কর্মনীতিটি গ্রহণ করলে (যেটি গ্রহণ করার স্বাধীন ক্ষমতা তোমাদের দেয়া হয়েছে) তোমরা দুনিয়ায় শান্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা লাভ করবে। তারপর আমার কাছে ফিরে আসলে আমি তোমাদের দান করবো চিরন্তন আরাম ও আনন্দের আবাস জান্নাত। আর দ্বিতীয় কর্মনীতিটি গ্রহণ করলে (যেটি গ্রহণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা তোমাদের দেয়া হয়েছে) তোমাদের দুনিয়ায় বিপর্যয় ও

www.nagorikpathagar.org

অস্থিরতার মুখোমুখি হতে হবে এবং দুনিয়ার জীবন শেষ করে আখিরাতে প্রবেশকালে সেখানে জাহান্নাম নামক চিরন্তন, মর্মজ্বালা, দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের গভীর গর্তে তোমরা নিক্ষিপ্ত হবে।

৩. এ কথা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়ার পর বিশ্ব-জাহানের মালিক সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানবজাতিকে পৃথিবীতে বসবাস করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মানবজাতির দুই সদস্য (আদম ও হাওয়া) বিশিষ্ট প্রথম গ্রুপকে তিনি পৃথিবীতে জীবনযাপন করার জন্য বিধান দান করেন। এই বিধান অনুযায়ী তাদের ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের দুনিয়ার সমস্ত কাজ-কারবার চালিয়ে যেতে হবে। মানুষের এই প্রাথমিক বংশধররা মূর্খতা, অজ্ঞতা ও অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্ট হননি। আল্লাহ পৃথিবীতে তাদের জীবনের সূচনা করেন সম্পূর্ণ আলোর মধ্যে, তারা সত্যকে জানতেন। তাদেরকে জীবন বিধান দেয়া হয়েছিল। আল্লাহর আনুগত্য (অর্থাৎ ইসলাম) ছিল তাদের জীবন পদ্ধতি। তাঁরা তাঁদের সন্তানদেরও আল্লাহর অনুগত বান্দাহ (মুসলিম) হিসেবে জীবনযাপন করার কথা শিখিয়ে গেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে শত শত বছরের জীবনাচরণে মানুষ ধীরে ধীরে এই সঠিক জীবনপদ্ধতি (অর্থাৎ দ্বীন) থেকে দূরে সরে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের ভুল কর্মনীতি অবলম্বন করেছে। গাফিলতির ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে তারা এক সময় এই সঠিক জীবনপদ্ধতি হারিয়ে ফেলেছে। আবার শয়তানি প্ররোচনায় একে বিকৃতও করেছে। তারা পৃথবী ও আকাশের মানবিক ও অমানবিক এবং কাল্পনিক ও বস্তুগত বিভিন্ন সত্তাকে আল্লাহর সাথে কাজ-কারবারে শরিক করেছে। আল্লাহপ্রদত্ত যথার্থ জ্ঞানের (আল ইলম) মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কল্পনা, ভাববাদ, মনগড়া মতবাদ ও দর্শনের মিশ্রণ ঘটিয়ে তারা অসংখ্য ধর্মের সৃষ্টি করেছে। তারা আল্লাহর নির্ধারিত ন্যায়নিষ্ঠ ও ভারসাম্যপূর্ণ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক নীতি (শরিয়াত) পরিহার বা বিকৃত করে নিজেদের প্রবৃত্তি, স্বার্থ ও ঝোঁকপ্রবণতা অনুযায়ী জীবন-যাপনের জন্য নিজেরাই এমন বিধান তৈরি করেছে যার ফলে আল্লাহর এই যমিন জুলুম-নিপীড়নে ভরে গেছে।

৪. আল্লাহ যদি তাঁর স্রষ্টাসুলভ ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিপথগামী মানুষদেরকে জোরপূর্বক সঠিক কর্মনীতি ও জীবনধারার দিকে ঘুরিয়ে দিতেন তাহলে তা হতো মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত সীমিত স্বাধীনতা দান নীতির পরিপন্থী। আবার এ ধরনের বিদ্রোহ দেখা দেয়ার সাথে সাথেই তিনি যদি মানুষকে ধ্বংস করে দিতেন তাহলে সেটি হতো সমগ্র মানবজাতিকে পৃথিবীতে

www.nagorikpathagar.org

কাজ করার জন্য তিনি যে সময় ও সুযোগ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার সাথে অসামঞ্জস্যশীল। সৃষ্টির প্রথমদিন থেকে তিনি যে দায়িত্বটি গ্রহণ করেছিলেন সেটি ছিল এই যে, মানুষের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেখে কাজের মাঝখানে যেসব সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে তার মধ্য দিয়েই তিনি তাকে পথনির্দেশনা দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। কাজেই নিজের ওপর আরোপিত দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি মানবজাতির মধ্য থেকে এমন একদল লোককে ব্যবহার করতে শুরু করেন যাঁরা তাঁর ওপর ঈমান রাখতেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে যেতেন। এঁদেরকে তিনি করেন নিজের প্রতিনিধি। এঁদের কাছে পাঠান নিজের অলংঘনীয় বাণী। যথার্থ সত্য জ্ঞান ও জীবন-যাপনের সঠিক বিধান এঁদেরকে দান করে, তিনি বনি আদমকে ভুল পথ থেকে এই সহজ-সত্য পথের দিকে ফিরে আসার দাওয়াত দেয়ার জন্য এদেরকে নিযুক্ত করেন।

৫. এঁরা ছিলেন আল্লাহর নবী। বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে আল্লাহ তাঁর নবী পাঠাতে থাকেন। হাজার হাজার বছর থেকে তাদের আগমনের এ সিলসিলা বা ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। তাঁদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার। তাঁরা সবাই একই দ্বীনের তথা জীবনপদ্ধতির অনুসারী ছিলেন। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই মানুষকে যে সঠিক কর্মনীতির সাথে পরিচিত করানো হয়েছিল তাঁরা সবাই ছিলেন তারই অনুসারী। তাঁরা সবাই ছিলেন একই হেদায়াতের প্রতি অনুগত। অর্থাৎ প্রথম দিন থেকেই মানুষের জন্য নৈতিকতা ও সমাজ-সংস্কৃতির যে চিরন্তন নীতি নির্ধারণ করা হয়েছিল তাঁরা ছিলেন তারই প্রতি অনুগত। তাঁদের সবার একই মিশন ছিল। অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের বংশধর, গোত্র ও জাতিকে এই দ্বীন ও হেদায়াতের দিকে আহ্বান জানান। তারপর যারা এ আহ্বান গ্রহণ করে তাদেরকে সংগঠিত করে এমন একটি উম্মতে পরিণত করেন যাঁরা নিজেরা হন আল্লাহর আইনের অনুগত এবং দুনিয়ায় আল্লাহর আইনের আনুগত্য কায়েম করার এবং তাঁর আইনের বিরুদ্ধাচরণ প্রবণতা প্রতিরোধ করার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে থাকেন। এই নবীগণ প্রত্যেকেই তাঁদের নিজেদের যুগে অত্যন্ত সুচারুরূপে এ মিশনের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু সবসময় দেখা গেছে মানবগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ তাঁদের দাওয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুতই হয়নি। আর যারা এই দাওয়াত গ্রহণ করে উম্মতে মুসলিমার অঙ্গীভূত হয় তারাও ধীরে ধীরে

www.nagorikpathagar.org

নিজেরাই বিকৃতির সাগরে তলিয়ে যেতে থাকে। এমনকি তাদের কোনো কোনো উম্মত আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েতকে একেবারেই হারিয়ে ফেলে। আবার কেউ কেউ আল্লাহর বাণীর সাথে নিজেদের কথার মিশ্রণ ঘটিয়ে এবং তার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে তার চেহারাই বিকৃত করে দেয়।

৬. সবশেষে বিশ্ব-জাহানের প্রভু সর্বশক্তিমান আল্লাহ আরব দেশে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠান। ইতঃপূর্বে বিভিন্ন নবীকে তিনি যে দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপরও সেই একই দায়িত্ব অর্পণ করেন। সাধারণ মানুষের সাথে সাথে পূর্বে নবীদের পথভ্রষ্ট উম্মতদেরকেও তিনি আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান জানান। সবাইকে সঠিক কর্মনীতি ও সঠিক পথ গ্রহণের দাওয়াত দেন। সবার কাছে নতুন করে আল্লাহর হেদায়াত পৌঁছে দেয়া এবং এই দাওয়াত ও হেদায়াত গ্রহণকারীদেরকে এমন একটি উম্মতে পরিণত করাই ছিল তাঁর কাজ যেন একদিকে আল্লাহর হেদায়েতের ওপর নিজেদের জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে এবং অন্যদিকে সমগ্র দুনিয়ার সংশোধন ও সংস্কার সাধনের জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাবে।’

(সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী : তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা)

www.nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট

ইউরোপে রেনেসাঁ যুগে গির্জা ও পাদ্রীদের সাথে বুদ্ধিজীবীদের সংঘাতের কারণে সৃষ্টি হয় সেকুলারিজম। সেকুলার আন্দোলনের চিন্তানায়ক ও অগ্রনায়কগণ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাই সেকুলারিজমের সঠিক ব্যাখ্যা। প্রাচ্যের কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী তাদের মনমতো করে সেকুলারিজমের ব্যাখ্যা দিতে চান। যেহেতু এ মতবাদ প্রাচ্যের নয় পাশ্চাত্যের, তাই পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের ব্যাখ্যাই সেকুলারিজমের সঠিক ব্যাখ্যা।

আজকাল পাশ্চাত্য জগৎ ধর্মের ব্যাপারে আগের মারমুখী অবস্থানে আর নেই। পাশ্চাত্যের সেকুলার সমাজ সেকুলারিজমের আদি-অন্ত (A to Z) অনুসরণ করার ফলে মানবতা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে যার কিঞ্চিৎ বর্ণনা অত্র পুস্তকের একাদশ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের উপলব্ধিতে বিষয়টি এসেছে। সম্প্রতি তাদের সচেতন লোকেরা ধর্মের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে কিছু উদাহরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. বিলেতে Monarch is the Head of the Church. বিলেতের রাজা বা রানী Supreme defender of protestant Faith. বিলেতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী Protestant Faith ত্যাগ করে Catholic Faith গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি তা করতে পারেননি। মন্ত্রিত্ব থেকে অবসর নিয়ে তিনি Catholic হয়েছেন। বিলেতের রানী সেখানকার বৃহত্তম গির্জা Anglican Church এর প্রধান। বিলেতের আইন পরিষদের উচ্চকক্ষ House of Lords এ ২৫টি আসন ধর্মযাজকদের জন্য সংরক্ষিত। বিলেতের রাজা বা রানীর অভিষেক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আর্চবিশপ অব ক্যান্টারবারি। আর্চবিশপ রাজা বা রানীর মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেবার পর তিনি আইনত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

২. আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাইবেলের উপর হাত রেখে শপথ গ্রহণ করেন। মার্কিন ডলারের গায়ে লেখা আছে : "In God we Trust."

আমেরিকায় ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন কাজ করছে।

www.nagorikpathagar.org

৩. পাশ্চাত্যের দেশসমূহে ধর্মের নামে এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহ কাজ করছে। তাদের কয়েকটির নাম নিম্নে প্রদান করা হলো :

স্কটল্যান্ড	–	স্কটিশ ক্রিশ্চিয়ান পার্টি।
অস্ট্রেলিয়া	–	১২টি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল আছে।
কিউবা	–	ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টি।
জার্মানি	–	ক্রিশ্চিয়ান সসিয়েলিস্ট পার্টি।
সুইজারল্যান্ড	–	ক্রিশ্চিয়ান পিপুলস পার্টি।
		ক্রিশ্চিয়ান সসিয়েলিস্ট পার্টি।
		ইভানজেলিক পিপুলস পার্টি।
নেদারল্যান্ড	–	ডাচ ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টি।
		ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন।
ইতালি	–	ক্রিশ্চিয়ান ইউনিয়ন।
অস্ট্রিয়া	–	ক্রিশ্চিয়ান সসিয়েল পার্টি।

এছাড়া কানাডা, বলিভিয়া, পাপুয়া নিউগিনি, পানামা, রোমানিয়া, নরওয়ে, সুইডেন, সার্বিয়া, এস্তোনিয়া, আলবেনিয়া, হাঙ্গেরি, হাইতি, দক্ষিণ আফ্রিকায় আছে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টি।

আমাদের নিকটতম বৃহত্তম প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত। ভারত সাংবিধানিকভাবে একটি Secular State.

১৯৪৭ সালে আমেরিকার বিখ্যাত 'Life' ম্যাগাজিনে একটি ফটো প্রকাশিত হয়। ফটোর নিচে লেখা ছিল :

* ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ও তার মন্ত্রিসভা অগ্নিদেবতাকে সাক্ষী রেখে শপথ নিচ্ছেন, আর হিন্দু পুরোহিতরা বেদমন্ত্র পড়ে মন্ত্রিসভাকে আশীর্বাদ করছেন।
* ভারতের জাতীয় পতাকায় ধর্মের চিহ্ন বিদ্যমান। তাদের রাষ্ট্রীয় দলিল দস্তাবেজ ও চিঠিপত্রে দেবতা ব্রহ্মার প্রতীক ব্যবহার করা হয়।
* ভারতে একদিকে আছে BJP, শিবসেনা, বজরং পার্টি, রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের মতো দল, অন্যদিকে আছে : জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ প্রভৃতি দল।

www.nagorikpathagar.org

সৃজনশীল বই প্রকাশক ও বিক্রেতা

প্রত্যয় প্রকাশনী

৪৯১ ডি/২, এলিফেন্ট রোড, ওয়ারলেস রেলগেট, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মোবাইল : ০১৬৮৪৫১১৬৬৮, ০১৯৬৬০৫১৮৫৪